বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

ওঁ

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫১তম বর্ষ ◆ নবম সংখ্যা ◆ বৈশাখ, ১৪৩৩ [এপ্রিল, ২০২৬]

রামসীতা সাজে রামনবমীর শোভাযাত্রা, কৃষ্ণনগর, উত্তর নদীয়া জেলা, মধ্যবঙ্গ

রামনবমীর শোভাযাত্রা, সুন্দরবন জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

রামনবমীর শোভাযাত্রা, ঝাড়গ্রাম জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

রামনবমীর শোভাযাত্রা, ব্রহ্মপুর জেলা, মধ্যবঙ্গ

কল্যাণ বাণী

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।। ১৮/২৫।।

'মোহের বশে, ফলাফলের কথা চিন্তা না করে, শক্তি ও ধনক্ষয়, পরপীড়ন এবং নিজের সামর্থ্য বিচার না করে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামসিক বলা হয়।'

সম্পাদকীয়...

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে ভাবনাটা তৈরি হয়েছিল যে, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বয়ং শাসিত সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে ২১শে মার্চ, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হল নির্বাচন কমিশন। গর্বের বিষয় হল, প্রথম নির্বাচন কমিশনার ছিলেন একজন বাঙালি, যার নাম সুকুমার সেন। এই বঙ্গ সন্তানের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি। ওঁনার পড়াশোনা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়। সেখান থেকে গণিত বিদ্যায় স্বর্ণপদক পান। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে' যোগদান করেন। ওঁনার ব্যবস্থাপনায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর প্রথম ভোট গ্রহণ শুরু হয়, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটে লোকসভা এবং বিধানসভা একসাথেই হয়েছিল। ভোটগ্রহণের জন্য এক একটি ভোট কর্মীর দল বুথে বুথে ঘুরে ভোটের আয়োজন করে। প্রায় ৩৬ কোটি ভারতীয়র মধ্যে সেই সময় ভোট অধিকার প্রয়োগ করে ১৭.৩২ কোটি মানুষ। ভোট গ্রহণ করার জন্য এক একটি প্রার্থীর জন্য এক একটি ব্যালাট বাক্স ছিল, যেখানে নির্দিষ্ট দলের প্রতীক চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। তখন আঙুলের ডগায় বেগুনি কালি লাগানোর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তারপর কারচুপি রুখতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির গবেষক ড. এম.এল গোয়েল আবিষ্কার করলেন, এক অদ্ভুত ধরনের রাসায়নিক কালি, যা রৌদ্রের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এলে চামড়ায় দীর্ঘস্থায়ী দাগ রেখে যায়। কিন্তু ভারতের সাধারণ নাগরিকদের কাছে এই নির্বাচন ছিল একটি উৎসবের মতন এবং নির্বাচন কমিশনের অস্তিত্ব ছিল অনেকটা কাগজের বাঘের মতো।

কিন্তু ৯-এর দশকের গোড়ায় একটি নাম তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার সেশন (সংক্ষেপে টি এন সেশন) এর নাম খবরের কাগজে শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন দেশের এক চিফ ইলেকশন কমিশনার (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত)। তিনি প্রচার করলেন, নির্বাচন কোন উৎসব নয়, আপনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাবার পদ্ধতি। ভোট প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পদ্ধতির যোগ করে নির্বাচন কমিশনকে এক উচ্চতর জায়গায় প্রতিষ্ঠত করেছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম খরচের হিসাব রাখা, ভিডিওগ্রাফি করে রাখার পদ্ধতি চালু, কড়া পর্যবেক্ষণ এবং কড়া শাস্তি দেওয়ায় দাওয়াই চালু করেন। এমনকি তিনিই প্রথম, ভোটার আইডি কার্ড বা ইলেক্টোর‍্যাল ফটো আইডেন্টি কার্ড চালু করার জন্য স্পেশালি সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে দু'কোটি এপিক ভোটার কার্ডের কাজ শেষ করেছিলেন।

আগামী ২৩শে এবং ২৯শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণ করা হবে। যদিও তার সঙ্গে ভারতবর্ষের আরও চারটি রাজ্যে ভোট গ্রহণ করা হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দিন কি কি হয় তা আমরা সবাই জানি। বেশ কিছু বুথের ভিতরে বিকেল তিনটের থেকে কি কি হয় সেটা আমরা জানি না। কিন্তু অনুমান করে নিই। পশ্চিমবঙ্গের ভোট মানে গণতন্ত্রের উৎসবও নয় কিংবা অধিকারের সিদ্ধান্তও নয়, বরং গুণ্ডাতন্ত্রের বিকৃত উল্লাস। বোম পড়ছে, গুলি চলছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। ভোটের আগে সন্ত্রাস, ভোটের সময় সন্ত্রাস, এমনকি ভোটের পরেও সন্ত্রাস। গত ২০২১-এর নির্বাচনে হিংসা, রক্তপাতের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থান পেয়েছিল। তবে হিংসাত্মক কার্যকলাপকে কখনো সমর্থনযোগ্য বলে মানুষ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই রাজ্যে বিরোধী দলের কর্মীদের মারধর করা, হত্যা করা, তাদের ঘরছাড়া করা, তাদের পার্টি অফিসগুলো দখল করে নেওয়া ইত্যাদি কার্যকলাপ আমরা দেখেছি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে মাওবাদী কিংবা গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন, এসব থেকেই ঘটেছিল রক্তপাত। স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামেগঞ্জে, কলকারখানায় যখন কৃষক-শ্রমিকদের আন্দোলন হয়েছিল, তখন তাদের বাগে আনতে কংগ্রেস পার্টিকে দমন নীতি প্রয়োগ করতে দেখেছি এবং মানুষের রক্ত ঝরেছিল। সেসব ইতিহাস বলে মনে হলেও, তার মধ্যে ছিল ন্যূনতম আদর্শগত লড়াই। কিন্তু কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় বসে সর্বশক্তিমান সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিরোধী দলগুলোর ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে। এইভাবে কেটে গেল ৩৪ বছর। পতন ঘটল, লাল পার্টি সি.পি.এম সাম্রাজ্যের। নতুন পার্টি ক্ষমতায় এল, কিন্তু এবারও দেখা গেল সেই উইপোকার দল রাতারাতি কাস্তে হাতুড়ি ছেড়ে ঘাসফুল হয়ে গেল। ফের শুরু হল বিরোধী উৎপাটন যজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক কেন্দ্রে ভোট লুট কারীদের দল ও লিডার আছে, যারা রীতিমতো ট্রেনিং প্রাপ্ত। তাদের কোটি কোটি টাকা দিয়ে পুষে রাখে শাসকগোষ্ঠী। সবাই জানে কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলে না। অনেকেই বলেন যে, 'পশ্চিমবঙ্গে রক্তপাতহীন ভোট সোনার পাথর বাটি'। আগেও

অশান্তি ছিল, আর গত ১৫ বছরে তা চরমে পৌঁছে গেছে, সেটাও সবাই জানে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজনীতির কি অবসান হবে না? অন্য প্রদেশে কিংবা দেশেও ক্ষমতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোথাও এমন মার, দাঙ্গা, রক্তপাত, ঘর জ্বালানোর মতো ঘটনা কি ঘটে? গণতন্ত্রের দশটা আঙুল হল বিরোধী দল। তাদের নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের প্রশ্ন, এবার কি বাংলা অন্যরকম ভোট দেখতে চলেছে? জানা গেছে ১০০ শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং এর সাহায্যে বুথের ভিতরের সব দৃশ্য ইন্টারনেটে চলে আসবে, আর সেগুলোর রেকর্ড থাকবে। ইলেকশন চিফ কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং প্রদেশের ইলেকশান কমিশনার শ্রীমনোজ আগারওয়াল যদি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়ে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে করাতে সক্ষম হন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের অন্তর থেকে আশীর্বাদ করবেন। তবে এই বিষয়ে সাধারণ মানুষেরও একটা দায়িত্ব আছে। নিজের ভোট নিজে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে অবশ্যই দেওয়া উচিত। ১০০% মানুষ ভোট দান করলেই আমরা আমাদের নাগরিক কর্তব্যকে পালন করতে পারব। তা নইলে আমাদের প্রজন্ম কিন্তু বলবে, 'তোমরা যেন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছিলে বলে, পশ্চিমবঙ্গ আজ পিছিয়ে পড়া রাজ্যের শ্রেণীতে এসে গেছে।' তাই সবাইকে একজোট হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট করাতেই হবে।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ এবং বিধানসভা গুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাস করিয়েছিলেন, তা আমরা সবাই জানি। এর ফলে লোকসভাতে সংসদদের মোট সংখ্যা বেড়ে ৮১৬ হয়ে যাবে, যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ২৭৩ হবে। কিন্তু এটি চালু করার জন্য লোকসভা ও বিধানসভার সিটের পরিসীমন ও জনগণনার পর লাগু করার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্র সরকার চাইছে ২০১১ এর জনগণনার আধারেই সব রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভার সিট ৫০% বাড়িয়ে, ৩৩% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত যেন করে দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্য সব দলের সম্মতি পাওয়ার জন্য, কেন্দ্রের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় দলগুলোর সঙ্গে শলা পরামর্শ করবেন। সকলের সম্মতি নিয়ে এই সংশোধিত আইন পাস করালেই ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের উত্তরপ্রদেশের এবং উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সিট ৩৩% হবে। যদিও অনুমান করা হচ্ছে এই বছর জুন মাসে পরিসীমন আয়োগের গঠন হবে।

মুঘল থেকে ইংরেজরা, সকলেই হিন্দুস্তানকে লুটবার এবং মেটানোর জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস করেছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ গর্বের সঙ্গে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, পরম্পরা এবং ভাষার উপর উর্দু ও ইংরেজি চাপানো বড় রূপে প্রয়াস করেছিল তারা। ইংরেজরা তো ভারতবর্ষের মানুষকে মানসিক রূপে গোলাম বানানোর জন্য ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মেকলের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দেয়। দেশের স্বাধীনতার পরেও কালো চামড়ার ইংরেজরা সেই শিক্ষা পদ্ধতিতেই চালিয়ে যায়। সরকারের উচিত ছিল স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করা, কিন্তু তারা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দেয়। ইংরেজি চাপানোর এত রকম প্রয়াস করার পরও ভারতবর্ষে ৪৫৩টি ভাষা এবং ১৩০০টি চলিত ভাষা আছে। যদিও সরকার মাত্র বাইশটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সম্প্রতি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ একটি পুস্তক বিমোচনের সময় বলেছেন, 'এমন সমাজের নির্মাণ দূরে নেই, যখন ইংরেজি ভাষার অনুগামীরা লজ্জাবোধ করবেন। দেশের ভাষাগুলো সংস্কৃতির রত্নস্বরূপ। আপন ভাষা ছাড়া আমরা সত্যিকারের ভারতীয় হতে পারব না। নিজেদের দেশ, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং নিজের ধর্মকে সঠিক পথে বোঝার জন্য কোন বিদেশি ভাষাই পর্যাপ্ত নয়। আমি জানি, এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস আছে ভারতীয় সমাজ অবশ্যই জয়লাভ করবে। একবার পুনরায় আমরা আমাদের দেশে আত্মসম্মানের সঙ্গে নিজেদের ভাষাকে স্থাপিত করে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেব।' বাস্তবে মহান সেই সমাজই হতে পারে, যারা নিজেদের অতীতের উপর গর্ববোধ করে, নিজের সংস্কৃতিকে সংবর্ধন করে, নিজের পরিচয়ের উপর গর্ববোধ করে।

অতীতে সনাতন ধর্ম এবং ভারতবর্ষ কেবলমাত্র গুরুকুল পরম্পরার মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষিত, সক্ষম, আত্মনির্ভর এবং সু-নাগরিক বানিয়ে এত সমৃদ্ধ ও সক্ষম ছিল। তারা মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞান চর্চা, গণিত, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়ে বিশেষজ্ঞ হতেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষানীতির সুবাদে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করতে চলেছে। বেশ কিছু রাজ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রকে হিন্দি ভাষার মাধ্যমে পড়ানো শুরু করে দিয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র আমাদের সংস্কৃতির পক্ষ ধরেনি, উপরন্ত সাহসের সঙ্গে তাদের এই নীতিকেও ঘোষণাও করেছে। আমাদের কোন ভাষার প্রতি বিদ্বেষ নেই, কিন্তু মাতৃভাষাকে অবশ্যই প্রাথমিকতা দেওয়ার অঙ্গীকার আছে, স্বদেশের প্রতি গর্ব এবং প্রেমের নিরিখে। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ (মে, ২০২৬) : রবীন্দ্র জয়ন্তী, শ্রীশঙ্করাচার্য জয়ন্তী, মহারানা প্রতাপ জয়ন্তী, বীর সভারকার জয়ন্তী, নারদ জয়ন্তী বিবিধ।
আষাঢ় ১৪৩৩ (জুন, ২০২৬) গঙ্গা দশহরা, স্নানযাত্রা, লোকনাথ বাবার পুজো তিথি, গুরু গোবিন্দ সিং জয়ন্তী, শ্যামাপ্রসাদ জয়ন্তী, সন্ত রবিদাস জয়ন্তী, বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ — ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ॐ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪

দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯, দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭

pnb

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9038149815m@pnb

MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ ✻ নবম সংখ্যা ✻ বৈশাখ, ১৪৩৩ (এপ্রিল, ২০২৬)

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর

● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল

● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৩
রাম : প্রসঙ্গ বর্ণাক্ষরার্থ ও প্রেক্ষিত একাল —শ্যামলচন্দ্র দাস ৬
সঙ্কোটমোচন মহাবীর—আলপনা ঘোষাল ৯
ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহা নিষ্ক্রমণ —গোপাল চক্রবর্তী ১১
‘যত মত তত পথ’ হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি—স্বামী মৃগানন্দ ১৩
এক অসাধারণ পদচারণা : ভগবান বুদ্ধ—রবিব্রত ঘোষ ১৫
চৈত্র নবরাত্রি ও তার তাৎপর্য—অর্পিতা বোস ১৭
‘পয়লা বৈশাখ’ বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম দিন —সরোজ চক্রবর্তী ১৯
বহু উদ্দেশ্যেই পর্ব অক্ষয় তৃতীয়া—আদিত্য দেব ২১
ভারতীয় সংবিধানের শিল্পকার : ড. ভীমরাও আম্বেদকর —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ২৩
বিকৃত ইতিহাস লিখন ভারতীয়দের প্রতি ষড়যন্ত্র —ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ২৫
ভারতবর্ষকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস নেতৃত্ব —রাজকুমারী মাহেশ্বরী ২৭
ভারতীয় নারী : পরিবর্তনের এবং রাষ্ট্র নির্মাণের অগ্রদূত —পারমিতা পাল ২৯
নদীয়া জেলার বীরনগরের প্রাচীন উলাইচণ্ডী মা —সুকন্যা পাল ৩২
বেলডাঙার ঘটনা আর কতদিন চলবে? —সুদীপনারায়ণ ঘোষ ৩৪
एक संत की अद्‌भुत वसीयत —स्वामी रामसुखदास जी महाराज पर विशेष ৪০
सनातन—पंडित जीवेश्वर मिश्र ৪১
रावण एवं कंस का युद्ध—अरुण चूड़ीवाल ৪২

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com

চিঠিপত্র বিভাগ
পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াট্‌অ্যাপ করুন ৭৮৭২৪৬১৬১৬

প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন **e-mail** কিংবা **WhatsApp**-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

রাম : প্রসঙ্গ বর্ণাক্ষরার্থ ও প্রেক্ষিত একাল

শ্যামলচন্দ্র দাস

অন্যান্য পুজো-আচ্চার তিথির মতো হিন্দু সনাতনী ভক্তবৃন্দের বিশেষ এক দেবতার জন্মতিথি এসে গেল। এই বিশেষ দেবতা আসলে এক মহাকাব্যের পৌরাণিক নায়ক, যার জন্য ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক ভারতীয় তথা বাঙালি কিংবদন্তি। কে তিনি? 'কহ মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।/নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যায় রঘুপতি রাম' (ভাষা ও ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ)'। এই মহোত্তম, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র আজ আর কেবল মহাকাব্যের নায়ক হিসেবেই নন, একুশ শতকের ভারতীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত জনপ্রিয় নাম। এজন্য নির্বাচনের মুখে গরিষ্ঠ হিন্দুগোষ্ঠী স্লোগানধর্মী উচ্চারণ করছে কালেভদ্রে 'জয় শ্রীরাম', 'জয় জয় শ্রীরাম' ইত্যাদি।

সেইসঙ্গে রামের পথ অর্থ দ্যোতক 'রামায়ণ' মহাকাব্য মুখ্যত শুদ্ধ চেতনার রূপকায়ন, রূপকায়নে শাশ্বত জীবনদর্শন। এই ধরনের চেতনারই পৌরাণিক ও আধুনিক ভাবনাযুক্ত জনপ্রিয় ভারতীয় মহাকাব্যে সীতা আসলে মন, দশ মাথার রাবণ আসলে দশ ইন্দ্রিয়, যা মনকে চুরি করে। বালি হল অবিদ্যা, সুগ্রীব বিদ্যা। মন ও চেতনাকে সমন্বিত করতে অবিদ্যা ও ইন্দ্রিয়কে বিচ্ছিন্ন বা বিনাশ করা বিধেয়, তবেই চেতনার সমাধি প্রাপ্তি সম্ভব। রামায়ণ এক অর্থে এই জাতীয় তত্ত্বকথার চিরন্তন রূপকে বিগহিত রেখেছে।

অন্যদিকে বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রচলিত রামখড়ি (গেরুয়া বর্ণের লেখার চক), রামধনু (বৃষ্টির পূর্বের সাতরঙা ধনুকের ন্যায় বাঁকানো প্রাকৃতিক বর্ণ সমাহার), রামগান, রামকথা বা রামলীলা, রামনবমী, রামরাজ্য বা রামরাজত্ব [আদর্শ শাসন ব্যবস্থা; তামিল শব্দ অনুসারে, রামরাজ্য মানে যা সুখের জন্ম দেয় (রামায়তি), যেখানে কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়, কারো ক্ষতি করাও উচিত নয়], রামভক্ত হনু, রামানুজ, রামবাণ (অব্যর্থ), অবিরাম, অভিরাম, মনোরম, নয়নাভিরাম, সংঘারাম (যে সংঘ চালায়) ইত্যাদি শব্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ভারতীয় সাংগীতের রাগ ও গৌড় মালদার একটি জনপদ যেখানে বছরে একবার করে বৈষ্ণবদের মেলা হয়, সেই 'রামকেলি'-ও প্রসঙ্গত ধর্তব্য। পরশুরাম, বলরাম ইত্যাদি নামও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। তবে বলা বাহুল্য যে অর্থের অবপতনওয়ালা রাম-বাচক শব্দ অনেক সময় বাংলা শব্দ ভান্ডারে পাওয়া যায়, যদিও স্বতন্ত্র অর্থসংকোচ বা অর্থসংক্রাম বা অর্থের অপকর্ষ এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নয়।

এই নামবাচক 'রাম' শব্দের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ বা ধ্বনি যদি আমরা আলোচনা করে দেখি তার নানামুখী তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়ে। কারণ বর্ণ বা ধ্বনির মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, যেহেতু বাঙালির ভাষার যে বর্ণ বা ধ্বনিগুলো প্রচলিত রয়েছে সেগুলো আসলে হিন্দু সনাতনী আধ্যাত্মিক ধারণার ভিত্তিতে নির্মিত। কেননা ৫৪টি বর্ণ আসলে ৫৪ ধরনের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যঞ্জনা প্রকট করে। যেমন 'অউম' এই উচ্চারণ ধ্বনিও আসলে আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জক। অ আসলে সৃষ্টির আদি ধ্বনি, ওঙ্কার, যা সৃষ্টি তথা দেব ব্রহ্মার দ্যোতক, উ স্থিতি তথা বিষ্ণু দেবের ব্যঞ্জক, ম হল লয় ও দেবাদিদেব মহাদেবের চিহ্নায়ক। সেজন্য শিবের অন্যান্য নাম ম-জাত-- মহেশ্বর, মহাদেব, মহেশ, মহাকাল ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে 'রাম' শব্দের রয়েছে ম বর্ণ, যাতে রয়েছে রাবণ বংশ, এমনকি পৌরাণিক লঙ্কারাষ্ট্র ধ্বংস তথা বিনাশের আভাস। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে প্রচলিত জনপ্রিয় সনাতন দেবদেবীদের যেসব নাম প্রচলিত রয়েছে তাদের গঠিত অক্ষরগুলোর মধ্যে কিছু বর্ণ-ধ্বনি রয়েছে যেগুলো আসলে যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। যেমন ক, ব, ম, র, স ইত্যাদি ধ্বনির আধিক্য অনেক সময় দেব-দেবীর অষ্টোত্তর শতনামগুলিতে সুলভ হয়ে থাকে। ক-এ যেমন কৃষ্ণ, কেষ্ট, কেশব, কানাই; ব-এ বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বজরংবলী, শিব, পার্বতী; র-এ রুদ্র, রাঘব, রঘুপতি, রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, রামভদ্র, রাজীবলোচন, রাধারমন, রাধিকা, রাসেশ্বরী প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

এই র বা রা আসলে গভীর অর্থ ব্যঞ্জক। সংস্কৃত শব্দ রাম-এর অর্থ হল অন্ধকার, কৃষ্ণবর্ণ, কালো বা কালো মানুষ। অথর্ববেদে কালো গাঢ় রঙের অন্ধকার বা রাত্রি বোঝাতে রা শব্দ বা অক্ষরের প্রয়োগ ছিল। তুলনীয় শব্দ

'রাকা', অর্থাৎ পূর্ণিমার আলোকিত রাত, যা আসলে দীর্ঘ দিনের অন্ধকারকে দূরীভূত করে আগত হয়। দেহধারী মানব রাম সেদিক থেকে কালো বর্ণের ছিলেন, যা অযোধ্যার মন্দিরের সম্প্রতি রামলালা বিগ্রহে প্রতিফলিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠী আসলে কালো বর্ণের মানুষ, যাদের প্রতিভূ কি এই শ্রীরাম চন্দ্রমা? তামিল শব্দ ইরামন আসলে ইরগু গাঢ় কালো, আমগু তৈরি, আনগুপুং প্রত্যয়। সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায়--কালো বর্ণে সৃষ্ট মানুষ। কালো বা অন্ধকারকে দূর করবার জন্য যৌগিক শব্দে 'চন্দ্র'-এর প্রয়োজন ছিল? সম্ভবত ছিল, আজও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এত নেতিবাচক প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটেছে, বেকারত্ব, দুর্নীতি, ধর্ষণ, কাটমানি ইত্যাদি হাজার রকমের নেতিবাচকতা আজ বাঙালি সমাজকে অন্ধকারে প্রায় নিমজ্জিত করতে বসেছে। অসংখ্য অ-সজ্জন ব্যক্তিরা এখন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতে চলেছে। সেজন্য এই রাম আরাধনার প্রয়োজন খুব জরুরি হয়ে গেছে, অন্তত একুশ শতকের তৃতীয় দশকের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে।

রা অন্য অর্থে সাদাও বোঝায়। সাদা বর্ণের রামের বিগ্রহ অনেকসময় পাওয়া যায়। এই বর্ণ সাদা শান্তির প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের অশান্ত-বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থায় বর্তমানে রামরাজ্যের প্রত্যাশা প্রায় সুদূর পরাহত। শান্তি, শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক মেলবন্ধন ইত্যাদি খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনকার পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সে রামও নেই, সে রামরাজ্য অযোধ্যা তথা পশ্চিমবঙ্গও এখন প্রায় দুর্লভ।

অন্যদিক থেকে দেখলে, এই শব্দস্থ র বর্ণের অর্থ হতে পারে সূর্য, আলো, আগুন, তেজ, রশ্মি ইত্যাদি। আর ম হল আমি, আমার ব্যঞ্জনা দ্যোতক। র-এর সাথে আ(া)-কার যোগ হলে স্থান ও কালগত ভাবে বিস্তৃত, প্রসারিত, সম্প্রসারিত আলোর ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। ফলে আলো তখন মানসিক জ্ঞান ও শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। এইভাবেই 'রাম' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আমার বা আমাদের হৃদয়ে তেজ বা জাজ্বল্যমান আলো। অন্যদিক থেকে ভাবলে ম হল মনের প্রতীক, আত্মার-ও। সেদিক থেকে র হলো অগ্নি বা সূর্য বীজমন্ত্র; ম হল চন্দ্র বীজ বা অমৃত বীজ মন্ত্র তথা শিবশক্তি, আত্মা-পরমাত্মা। পদার্থ জাত বা দেহজ শক্তিও বটে। এজন্য রাম দেহ-আধারে অন্তর্নিহিত শক্তি জাগানোর শব্দ। ফলে রাম শব্দ উল্টো করে লিখলে যা দাঁড়ায়, তা হল মরা বা মারা। অর্থাৎ দেহ শক্তির হানি তথা প্রাণের বিনাশ বা মৃত্যু। সেই জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় উল্টোকথন রীতির শব্দে রত্নাকর দস্যুর সাধনা 'মরা মরা', যা দীর্ঘকাল সচল ছিল পাপপঙ্ক স্খালনের জন্য। এই সাধনায় তিনি আসলে নেতির সাধনা থেকে ইতিতে পৌঁছে যান। মরা থেকে রামে উত্তরণ ঘটে। স্মরণীয় যে, 'একবার রাম নামে যত পাপ হরে,/ পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।'

এদিক থেকে রম হল আলোর সন্ধানী পরমাত্মা জাত জাগ্রত মানুষত্ব। যেহেতু পৌরাণিক মহাকাব্যের নায়ক রাম জন্মসূত্রে ছিলেন সূর্যবংশীয়। সেক্ষেত্রে রাম-নবমী উৎসব আসলে ভারতীয় হিন্দু সনাতনীদের নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তেজ বা আলোক প্রজ্বলনের উৎসব। একুশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই হিন্দু গোষ্ঠীর সম্মিলিত আত্মকিরণ জাগরুকের প্রয়োজনও রয়েছে।

রাম শব্দের মূলে রয়েছে রম, যার অর্থ খেলাধুলা করা। মুক্তমনাদের মনে খেলাধুলা করার যে শক্তি জাগ্রত হয়, তাই আসলে রম, তুলনীয় শব্দ হল রমণীয় ('একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়')। যা আনন্দগ্রাহক পরম ভোক্তা, সাধু-সজ্জনরা অনেকসময় আত্মা-পরমাত্মার অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করে থাকে, মুনি -যোগী-ঋষি, মুক্ত জ্ঞানী, সাধু-সজ্জনরা এই ধরনের রমণীয়তা অনুভব করে থাকেন মনের মণিকোঠায়। কারণ **'तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम हे। राम सुमित ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे।'**

আত্মা পরম আত্মার আনন্দ যেখানে আভাসিত হয় সেই রাম শব্দের অন্য অর্থ হল প্রিয়। দেবতা আর প্রিয়র মধ্যে তেমন কোনও তফাৎ সাধারণত নেই।

'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'

(বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ)

রাম সেদিক থেকে ঘরের প্রিয় মানুষ (পুত্র, দাদা, পিতা, স্বামী,...) আরাধ্য দেবতাও।

র হল আরাম শান্তি, যা লক্ষ্মী শব্দের প্রতিরূপ

রমা-তে লক্ষণীয়। সেজন্য 'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে/ আমার এই ঘরে থাকো আলো করে' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ গৃহে মা লক্ষ্মীকে অচলা করে রাখবার প্রয়াস রাঢ় গ্রামীণ বাঙালিদের মধ্যে আজও প্রচলিত রয়েছে। রাধা-তে রা অর্থাৎ আত্মার আনন্দ, তৃপ্তি ইত্যাদি ধা-তে লব্ধ। সেজন্য রাধা হলেন কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের, আত্মার সাথে পরম আত্মার, র-এর সাথে ম-র মিলন হলে তা রাম-ত্বে উত্তীর্ণ হয়। যে সাধনা হিন্দু ভক্ত সনাতনীদের মধ্যে অনেকেই করে থাকেন।

আবার র শব্দের অর্থ হলো স্থির হওয়া, থামা, বিশ্রাম করা, রয়ে যাওয়া, সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি। রাঢ় বীরভূম মুর্শিদাবাদ-এর গ্রামীণ লোকভাষায় 'র র' বলে হাল বা চাষের গরু থামানো হয়। তাছাড়া 'র ঠ করা', অর্থাৎ ইতস্তত বোধ করা ইত্যাদিও বলা হয়। র-র সাথে -আম প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্ভবত রাম শব্দ গঠিত হয়েছে। সেজন্য আরাম, বিরাম, এগুলি বিরতি বা বিশ্রাম অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ব্যারাম গঠিত হয়েছে ব্যাগুব্যাকৃত বা বিশ্লিষ্ট হওয়া অর্থে। এগুলো আরাম-বিরাম ইত্যাদির বিপরীত অর্থব্যঞ্জক।

রা শব্দের অন্য অর্থ দান। ম হল আমি। আমাকে যে দেয়। কি দেয়? মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, আনন্দ, তৃপ্তি আরাম, প্রশান্তি। আদর্শ পৌরাণিক মহানায়ক রামচন্দ্র আমাদের এমনই প্রাণের শান্তি, মনের আরাম, যে তাঁর রামগান চিরন্তন শাশ্বত হয়ে এশিয়া মহাদেশ ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। কালের গণ্ডিও গেছে ছাড়িয়ে। সেখানেই ভক্তের মুখ ও মনের অন্তরে-অন্দরে সৌন্দর্যময় রাম শ্রীরামে পরিণত হন।

এইভাবে লক্ষ করলে বলা যায়, রাম শব্দের অন্তর্নিহিত অক্ষর বা বর্ণে বিগর্ভিত অর্থ রয়েছে তার বর্তমান প্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এ দিকটিই আমরা উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছি। ■

পরিষদ বার্তা

আই.আই.টি খড়্গপুরে 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র পাঠক সম্মেলন

গত ১০ই মার্চ বেলা ১ ঘটিকায় আই.আই.টি খড়্গপুর স্থিত ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারস বিল্ডিং-এর প্রথম তলে 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র পাঠক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আই.আই.টি-র নির্দেশক অধ্যাপক শ্রীসুমন চক্রবর্তী, ডিন অফ স্টুডেন্ট ওয়েলবিং অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী এবং প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত সহ সভাপতি তথা বিশ্ব হিন্দু বার্তার সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, প্রচার প্রসার প্রমুখ জয়ন্ত ভৌমিক, সহ প্রচার প্রসার প্রমুখ চন্দন গুপ্ত। এছাড়া বার্তার প্রান্ত কার্যালয় সম্পাদক শ্রীঅঙ্কিত ব্যানার্জি, আই.আই.টি খড়্গপুর বার্তার প্রমুখ শ্রীঅরুণাংশু ভূইয়াঁ এবং অন্যান্য পাঠক ও কার্যকর্তারা। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী মহাশয়কে আই.আই.টি খড়্গপুরের আহ্বায়ক রূপে কাজ করবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তিনি তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

রামনবীমর শোভাযাত্রা, বরানগর, দক্ষিণবঙ্গ

সঙ্কোটমোচন মহাবীর

আলপনা ঘোষাল

হনুমান বানর কেশরী ও অঞ্জনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হনুমান বায়ুর স্বর্গীয় পুত্র হিসাবেও পরিচিত। তার মা অঞ্জনা ছিলেন একজন অপ্সরা, যিনি অভিশাপের কারণে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রসন্তান প্রসবের পর তিনি অভিশাপ থেকে মুক্তি পান। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে যে তার মা অঞ্জনা যখন সন্তান লাভের জন্য রুদ্রের তপস্যা করছিলেন, তখন অযোধ্যার রাজা দশরথ সন্তান লাভের জন্য ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের তত্ত্বাবধানে পুত্রকামোষ্ঠীর অনুষ্ঠান করছিলেন। ফলস্বরূপ পায়েস পেয়েছিলেন, যা ভারতীয় মঙ্গলস্বরূপ বলে মান্য করা হয়। সেই পায়েস তিনি তাঁর তিন রানির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। যার ফলে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নের জন্ম হয়েছিল। কথিত আছে একটি চিল সেই পায়েস ছিনিয়ে নিয়ে অঞ্জনা যে বনে নিয়োজিত ছিলেন তার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ফেলে দেয়। বায়ু অঞ্জনার প্রসারিত হাতে পতনশীল পায়েস পৌঁছে দিলেন। তিনি এটি খেয়ে ফেললেন। ফলস্বরূপ হনুমানের জন্ম হল।

'হনুমান' শব্দের অর্থ বা উৎপত্তি অস্পষ্ট। হিন্দু ধর্মের দেবতাদের সাধারণত অনেকগুলো নাম থাকে। প্রত্যেকটি সেই দেবতার দ্বারা অর্জিত পৌরাণিক কাজের কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য, গুণ বা অনুস্মরকের উপর ভিত্তি করে। হনুমানের ব্যাখ্যা হল 'কদাকার চোয়াল'। অপর একটি সূত্র বলে 'হনুমান' নামটি এসেছে মানা (গর্ব) থেকে। হনুমান অর্থ সংস্কৃত হন ('হনন')। কিছু গ্রন্থ মতে হনুমান তার শৈশব হনুরাহাতে কাটিয়েছেন তাই তার নাম 'হনুমান'। পুরাণ কিংদন্তিতে শিশু হনুমান সূর্যকে ফল বলে ভুল করে। বীরত্বের সাথে এটিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। ঠিক তখনই ইন্দ্র হনুমানের ওপর বজ্রপ্রহার করলেন। বজ্রের ভীষণ আঘাতে হনুমান মহাশূন্য থেকে একটা পাহাড়ের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন। তাঁর বাঁদিকের হনু বা চোয়াল ভেঙে গেল। মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছেন হনুমান। পবনদের পুত্রের দুর্দশা দেখে অস্থির। সঙ্কল্প করলেন মর্ত্যলোক নিষ্প্রাণ করে দেবেন। এই ভেবে সর্বদেহের মধ্যে বিচরণকারী জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুর গতি রুদ্ধ করলেন এবং পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে প্রবেশ করলেন একটি গিরিগুহায়। জগতে বায়ুর গতি রুদ্ধ হলে মৃত্যু ছাড়া উপায় থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। শুধুই হা-হা করে প্রাণ চাই! বাতাস চাই!

মর্ত্যবাসীর সঙ্কট দেখে দেবতারা গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা সবই জানেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে পবনদেবের কাছে উপস্থিত হলেন। পবনদেবের কোলে শায়িত শিশুকে দেখে ব্রহ্মার প্রাণ গেল গলে। তিনি শিশুকে স্পর্শ করলেন। মৃতপ্রায় পবনপুত্র পুনর্জীবন পেয়ে উঠে বসলেন। পুত্রকে জীবিত দেখে বায়ু আগের মতো জগতে বিচরণ করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা উপস্থিত সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের একটি কথা বলে রাখি শোনো, ভবিষ্যতে এই শিশুর দ্বারা জগতের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে। এই শিশুর দ্বারা জগতের মঙ্গল হবে। তাই তোমরা বায়ুকে প্রসন্ন করতে শিশুকে বর দাও।

সর্বপ্রথম ইন্দ্র নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের কণ্ঠের পদ্মের মালা শিশুর গলায় পরিয়ে বললেন, ''আমার বজ্রে এই শিশুর হনু ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই আজ থেকে এর নাম 'হনুমান' হবে। আমি বর দিলাম যে আমার বজ্রে হনুমানের মৃত্যু হবে না।''

অন্ধকারনাশিনী সূর্য বললেন, ''আমার তেজের শততম অংশ দান করলাম। যখন ওর শাস্ত্র অধ্যায়নের বয়স হবে, তখন আমি শাস্ত্র পড়াব। যাতে কালে একজন বাগ্মী হয়ে উঠে।''

বরুণ দেবতা বর দিলেন, ''আমার বরে অযুত শত বৎসরেও হনুমানের মৃত্যু হবে না এবং আমার পাশাস্ত্র জল থেকে হনুমানের কোনো বিপদ হবে না।''

যম বর দিলেন, ''এই শিশু আমার দণ্ডের অবধ্য হবে। তাঁর কোনো রোগ হবে না।''

কুবের বললেন, ''আমার গদায় হনুমানের মৃত্যু লেখা নেই।''

মহাদেব বললেন, ''হনুমান আমার এবং আমার অস্ত্রের অবধ্য হবে।''

বিশ্বকর্মা উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তিনিও বললেন, ''আমি যে সমস্ত দিব্যাস্ত্র তৈরি করব, সেগুলো কোনটিও হনুমানের ক্ষতি করতে পারবে না।''

সবার শেষে ব্রহ্মা বর দিলেন, ''হনুমান দীর্ঘায়ু এবং ব্রহ্মাজ্ঞ হবে, আর ব্রহ্মশাপ কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।''

এভাবে সমস্ত দেবতাদের বলে বলীয়ান হয়ে হনুমান হয়ে উঠলেন, ''সাধুসন্তকে তুমি রাঘবরে। অসুর নিরন্দম রাম দুলালে।'' হনুমানকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে দেবতারা ফিরে গেলেন। পরে পবনদেব হনুমানকে নিয়ে গিয়ে অঞ্জনার কোলে তুলে দিলেন এবং তাঁকে বলে দিলেন, ''তোমার ছেলে মহাবীর, মহাজ্ঞানী, ব্রহ্মাজ্ঞ এবং অমর হবে।''

হনুমান হিন্দু ভক্তি-শক্তি পূজা ঐতিহ্যের দুটি সবচেয়ে পালিত বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করেছেন। 'বীরত্বপূর্ণ শক্তিশালী দৃঢ়তার শ্রেষ্ঠত্ব' এবং ব্যক্তিগত ঈশ্বরের প্রতি 'প্রেমময়, আবেগপূর্ণ ভক্তি', 'হনুমান' ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে হনুমত।

হনুমান জয়ন্তী বা হনুমান জন্মোৎসব একটি হিন্দু উৎসব। হনুমান জয়ন্তী উৎযাপন ভারতের প্রতিটি রাজ্যে সময় এবং ঐতিহ্য অনুসারে পরিবর্তিত। ভারতের বেশিরভাগ উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে এই উৎসবটি হিন্দু চৈত্র মাসের পূর্ণিমা দিনে পালিত হয়। কর্ণাটকে হনুমান জয়ন্তী শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে, মার্গশিরশা মাসে বা বৈশাখ মাসে পালন করা হয়, অন্যদিকে কেরল এবং তামিলনাড়ুতে হনুমান জয়ন্তী পালিত হয় মার্গালি (ধনু) মাসের অমাবশ্যা তিথিতে। নাঙ্গানাল্লুর নামাক্কাল, সুচিন্দ্রম, থিক্কাভিয়ুর এবং আলাথিয়ুরের মতো এই রাজ্যের বিখ্যাত হনুমান মন্দিরগুলোয় এই দিনটি ধূমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে।

তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে হনুমান জয়ন্তী ৪১ দিন ধরে পালিত হয়, যা চৈত্র পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় এবং বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে শেষ হয়।

মহারাষ্ট্রে হনুমান জয়ন্তী হিন্দু চন্দ্রমাসের চৈত্রের পূর্ণিমা তিথিতে (পূর্ণিমা) পালিত হয়। হনুমান জয়ন্তীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কিছু ধর্মীয় পঞ্জিকা অনুসারে জন্মদিন আশ্বিন মাসের অন্ধকার পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে (চতুর্দশী) পড়ে, আবার অন্যদের মতে এটি চৈত্রের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে পরে, এই দিনে হনুমান মন্দিরে, ভোরবেলা থেকে ভক্তদের ভীড় চোখে পড়ার মতো।

হনুমানকে বিষ্ণুর অবতার রামের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যিনি তার অদম্য ভক্তির জন্য ব্যাপকভাবে (হিন্দুদের কাছে পরিচিত) শক্তির প্রতীক হিসাবে পূজনীয়।

আধুনিক যুগে, হনুমানের মূর্তি এবং মন্দিরগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এছাড়া প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল এবং শনিবার বিশেষভাবে জনপ্রিয় দিন। কিছু হিন্দু এই দিনের যে কোন একটিতে আংশিক বা পূর্ণ উপবাস রাখেন এবং হনুমানের ধর্মতত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ভজন, কীর্তন, হনুমান চালিশা পাঠ করেন। 'সংকটে তেঁ হনুমান ছুড়াবৈ। মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ।' অর্থাৎ ঘোর সংকটে ব্যাকুল হয়ে মহাবীরকে ডাকলে তিনি শীঘ্রই ভক্তকে সংকট থেকে মুক্ত করেন।

হনুমান অজ্ঞান মোহে পতিত জীবকে দেখিয়েছেন উত্তরণের পথ। প্রচার করেছেন শুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য রামনামের মহিমা। হনুমানের মহৎ শিক্ষা—যেখানে কাম, সেখানে রাম নেই। সেখানে উগ্রতা, হিংসা, দ্বেষ, অহংকার, ভেদবুদ্ধি থাকে, সেখানে কখনই রামচন্দ্র বাস করেন না। কিন্তু যেখানে ভক্তি, প্রেম, বিনয়, মৈত্রীভাব সেখানেই রঘুবীরের নিবাস। যিনি নিষ্কাম, তিনি রামকে পাবেন। তাই হনুমানের ভক্তিতে কোনও কামনা নেই। তিনি আকুলভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে, রুদ্ধকণ্ঠে গদগদ ভাবে রঘুপতি—চরণে প্রার্থনা করেছেন।

নানা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েহস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ।।

''হে রঘুবীর, আমায় শুদ্ধভক্তি দাও, নির্ভরতা দাও, আর আমার মনকে কামাদিদোষশূন্য করে দাও। তুমি আমার ও অখিল লোকের আন্তরাত্মা। আমি সত্য বলছি, শুদ্ধভক্তি ছাড়া আমার হৃদয়ে আর কোন বাসনা নেই।''

মহাবীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ধ্বনিত হয় 'রাম! রাম!' শ্রীরামনাম অমৃত মন্ত্রবীজ 'রাম' নামকেই তারকব্রহ্ম নাম বলা হয় (মতান্তরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র)। এই নামের জোরে ভবসাগর পার হওয়া যায়। 'শ্রীরাম জয় রাম, জয় জয় রাম।' এই মন্ত্র হনুমানজির অতি প্রিয় মন্ত্র শতবার জপের বিধান রয়েছে। হনুমান এই মন্ত্র ধ্যান করেন। 'রাম! রাম! জয় রাজা রাম! রাম! রাম! সীতারাম!' রাম নাম যিনি করেন, তাঁর উপর বর্ষিত হয় মহাবীরের অশেষ কৃপা। ■

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহা নিষ্ক্রমণ

গোপাল চক্রবর্তী

পর্বতরাজ হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে এক রাজ্য ছিল। শাক্যরা এই রাজ্যের অধিবাসী। তাদের রাজা ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশীয় সমুদ্র সঞ্জাত চন্দ্রের মতো শুদ্ধোদন। শক থেকে শাক্য পদের উদ্ভব মনে করা হলেও, সম্ভবত এরা শাকাহারি ছিলেন বলেই শাক্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুদ্ধদেবকেও শাক্য সিংহ বলা হয়েছে। রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবীর, লুম্বিনী উদ্যানে প্রসব যাতনা ছাড়াই এক সর্বসুলক্ষন যুক্তপুত্র জন্মায়। ইতিপূর্বে মায়াদেবী স্বপ্নে, মেঘের মধ্যে চাঁদের মতো আপন শরীরে একটি শুভ্র গজরাজকে প্রবেশ করতে দেখেছিল, সেই স্বপ্নকে শুভ মনে করে তিনি একটুও ভীতা হননি। গর্ভধারণের পর অন্তরকে সর্ববিধ কলুষতা এবং পাপ থেকে মুক্ত করে তিনি বনে যেতেই মনস্থির করলেন। তপস্যার উপযোগী নির্জন বনভূমি তার আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় তিনি রাজাকে লুম্বিনী নামক উদ্যান কুঞ্জে যাওয়ার এবং থাকার কথা বললেন। যেটি পুষ্প, পল্লব এবং ফলবান বৃক্ষের সমন্বয়ে চিত্ররথ কাননের মতোই মনোহর ছিল।

পুষা নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের জন্ম। উরু থেকে ঔর্ব, হস্ত থেকে পৃথু, মাথা থেকে ইন্দ্র তুলল মান্ধাতা এবং বাহু মূল থেকে কক্ষী বানের মতো মাতার পার্শ্ব থেকে বুদ্ধের জন্ম হল। পৃথিবীতে অবতীর্ণ বালকটি সূর্যের মতো সহনীয়, তেজদীপ্ত হলেও কমনীয় কান্তি চন্দ্রের মতোই নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'অবদান' সাহিত্যে বুদ্ধকে 'সূর্যসহস্রাতিরেকপ্রভঃ' অর্থাৎ সহস্র সূর্যের মতো দীপ্তিমান অথচ চন্দ্রের মতো নয়ন মনোহর রূপে বর্ণিত হয়েছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু'তে তাঁকে 'বালরবিপ্রকাশ' বলা হয়েছে। দেবতারা কুমারের জন্মে আনন্দিত হলেন। কুমারের জন্মলগ্নে ভূমিকম্প হলেও সু-বাতাস প্রবাহিত হয় এবং মেঘশূন্য আকাশ থেকে সচন্দন পুষ্প বৃষ্টি হয়। এইসব অলৌকিক লক্ষণ বিচার করে, বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা বলেন এই নবজাতক পার্থিব সুখ চাইলে, রাজ চক্রবর্তী সম্রাট হবে। আর বৈরাগ্য প্রার্থনা করলে মহামুনি হয়ে শ্রেষ্ঠত্বে সকলকে অতিক্রম করবে। অন্তরীক্ষে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব বার্তা শ্রবণ করে মহর্ষি অসিত অতি দ্রুত কপিলাবস্তুতে এসে, রাজা শুদ্ধোদনের পুত্রকে দর্শন করলেন। রাজপুত্রের সুলক্ষণগুলি দর্শন করে ঋষি অশ্রুপাত করতে লাগলেন। কারণ তাঁর নিজের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায়, এই মহাপুরুষের অতুলনীয় শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। অসিত মুনির প্রস্থানের পর আনন্দিত রাজা কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তি দিলেন, ব্রাহ্মণের ভূমি ও গো-দান করলেন এবং আনুষাঙ্গিক ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান শেষ করে, পুত্রকে নিয়ে সপরিবারে রাজধানীতে ফিরলেন।

পুত্রের জন্মের পর রাজ্যে সমৃদ্ধির মহাপ্লাবন হল। শত্রুরা রাজার প্রধানত হল। 'মহাবস্তুবদান' থেকে জানা যায়, কুমার যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন একই সঙ্গে পাঁচশত শাক্য শিশু পুত্র, পাঁচশত শাক্য শিশু কন্যা, পাঁচশত দাস, পাঁচশত দাসী, পাঁচশত অশ্ব, পাঁচশত হস্তিও জন্মগ্রহণ করে। রাজা শুদ্ধোদন পাঁচশত নিধিপ্রাপ্ত হন। রাজমণ্ডলবর্তী রাজারাও প্রণাম জানিয়ে রাজা শুদ্ধোদনের উৎকর্ষ স্বীকার করেন। শিশুদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন যে সমৃদ্ধি এবং অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন, মহাকবি অশ্ব ঘোষের রচনাতেও তার সাড়ম্বর প্রকাশ রয়েছে।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পর কপিলাবস্তুতে বজ্রপাতহীন বৃষ্টি হল। বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন হল ফসল। রাজ্যে মিথ্যেবাদী, চোর অব্রতি, অদাতা, হিংস্র কেউ রইল না। সকল বিষয়ে সার্থকতা ঘটায় রাজা পুত্রের নামকরণ করলেন সর্বার্থ সিদ্ধ। বুদ্ধের জননী সতী সাধ্যি মায়াদেবী পুত্রের বিশাল প্রভাব দেখে, আনন্দ ধারণ করতে না পেরে, স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন। মাতৃসত্তা গৌতমী পরম স্নেহে শিশু সিদ্ধার্থকে পালন করলেন। গৌতমীর স্নেহে লালিত পালিত, তাই সিদ্ধার্থের আরেক নাম হল গৌতম। যথা সময়ে সিদ্ধার্থের উপনয়ন হল। অসামান্য প্রতিভাবান সিদ্ধার্থ অল্প সময়ে ব্রহ্মশাস্ত্রে পারদর্শী হলেন।

শৈশব থেকে সিদ্ধার্থ সংসারবির বিরাগী, ভাব জগতে তার গতাগতি। এই বিরাগী পুত্রকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পিতা শুদ্ধোধন সর্বসুলক্ষণা যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন। কোমলমতি সিদ্ধার্থ যাতে কোন ভয়ানক দৃশ্য না দেখেন, সেইজন্য রাজা শুদ্ধোদন সমুচ্চ

প্রাসাদের আভ্যন্তরে গুপ্ত কক্ষে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। রাজা নিজেও পুত্রের কল্যাণ কামনায় সংযত, কল্যাণকর জীবন যাপন করতেন। কালক্রমে সিদ্ধার্থের চন্দ্রের মতো রূপবান এক পুত্র লাভ হলো, তার নাম রাখা হল রাহুল।

অবরুদ্ধ কুমার চারনদের মুখে কুজনরত পক্ষী, দিঘী, শ্যামল বনানীর কথা শুনে বন দর্শনের উদগ্রীব হলেন। রাজার আদেশে সমস্ত অশুভ দৃশ্য পথ থেকে অপসারিত হল। সুসজ্জিত পুষ্পাকীর্ণ পথে রাজা সিদ্ধার্থকে বনভূমি দর্শনের অনুমতি দিলেন। স্বর্ণরথে কুমার চললেন বনভূমি দর্শনে। পুরনারীরা বাতায়ন থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে কুমারকে নিরীক্ষণ করলেন। হৃষ্টচিত্তে কুমার ভাবলেন তাঁর বুঝি পুনর্জন্ম হল। হঠাৎ দৈবক্রমে একপক্ককেশ, শিথিল, ন্যুব্জ, লাঠি হাতে এক বৃদ্ধাকে দেখলেন সিদ্ধার্থ। সারথিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ওই ব্যক্তি জরাগ্রস্থ। জরা রূপ, স্মৃতি, পরাক্রম ধ্বংস করে। সকলেই বয়সের ভারে জরাগ্রস্ত হয়। সেদিন বিষন্ন মনে কুমার প্রাসাদে ফিরলেন। ■

পরিষদ বার্তা

বাসন্তী পূজার আয়োজন

মধ্যবঙ্গ প্রান্তের পায়রাডাঙা কার্যালয়ে ভব্য বাসন্তী পূজার আয়োজন করা হয়। প্রতিবছরই এই পুজোর মাধ্যমে মা দুর্গার, বাসন্তী রূপের আরাধনা করা হয়। এই পূজার সময় স্থানীয় নিবাসীদের উৎসাহ দেখার মতো ছিল। এই পূজাতে বিশ্ব হিন্দু বার্তার সভাপতি এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর এবং বার্তার প্রচার প্রসার প্রমুখ শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক শ্রীবিজয় পাতর মহাশয়ের বিশেষ উপস্থিতি ছিল সেখানে। এছাড়া জেলার কার্যকর্তা ও পদাধিকারীরা সেখানে পূজাতে অংশগ্রহণ করেছেন।

হনুমান জয়ন্তী উৎসব পালন

গত ২রা এপ্রিল বিভিন্ন স্থানে যথাবিহিত রূপে হিন্দু সমাজ অতি পবিত্রতার সহিত হনুমান জয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। উল্লেখ করার মতো বিষয় এই যে, এই কর্মযজ্ঞে বিশ্ব হিন্দু বার্তার কার্য্যকর্তা শুভজিৎ দাস শ্যামনগর প্রখণ্ডে হনুমান জয়ন্তীতে উপস্থিত ছিলেন, কলকাতার কার্য্যকর্তা ললিত প্রামানিক এবং এ্যাডভোকেট শ্রীঅমিত অধিকারী মহাশয়ের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিশ্ব হিন্দু বার্তার পাঠক ও কার্য্যকর্তার সহযোগে বিশ্ব হিন্দু বার্তা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এই প্রথমবার হনুমান জয়ন্তী উৎসব পালন করে। উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু বার্তার সহঃ প্রচার ও প্রসার প্রমুখ দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় শ্রীচন্দন গুপ্তা মহাশয়।

প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের বৈঠক, পিংলা, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

দুর্গাবাহিনীর সম্মেলন, কাঁকিনাড়া, দক্ষিণবঙ্গ

‘যত মত তত পথ’ হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি

চৈত্র সংখ্যার পর....

স্বামী মৃগানন্দ

(পুনর্মুদ্রণ)

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ লাভ করলেন ঈশার দর্শন এবং ক্রমে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হ’য়ে সমাধিস্ত হলেন। এই সমাধি বা চরম অবস্থা হিন্দুমতের উপলব্ধি। অর্থাৎ সেই অদ্বৈততত্ত্বের ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবার মন হয়ে যাচ্ছে ভূমার স্বরূপ। আবার মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে এসে বলতে পারছেন উদারতার কথা, বিশ্বপ্রেমের কথা। অর্থাৎ যত মত তত পথের উক্তি সমগ্র খ্রিষ্টানধর্মকে জড়িয়ে নয় এবং খ্রিষ্টানধর্মাবলম্বীগণও ঐ উক্তিকে নিজেদের সঙ্গে জড়িয়ে মেনে নিতে পারেন না কারণ, সেটা হবে তাঁদের স্বধর্মবিরুদ্ধ।

অতএব এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, সময়ের নিরিখে এবং যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের নিরিখে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী যত মত তত পথ বিশাল হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ধর্মমার্গের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে ঘোষণা করেছে, সামগ্রিকরূপে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও খ্রিষ্টানধর্মরূপী তিন মত পথের মধ্যে নয়।

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দু’এক জায়গায় আমরা দেখতে পাই শ্রীঠাকুরই বলেছেন—‘‘আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল-এ মত ভাল নয়। ঈশ্বর এক-এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খ্রিষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক। মত-পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।’’

‘‘বেদ পুরাণ তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।’’

আর এক জায়গায় বলছেন শ্রীঠাকুর—‘‘আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, ‘এ কথা বোলো না—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা ভুল।’ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।’’

শ্রীরামকৃষ্ণ এ ধরনের কথা যখনই বলছেন, তখনই বুঝতে হবে তাঁর নিজস্ব সাধনা ও ভাব অনুসারে তিনি ঐ কথা বলেছেন। পূর্বের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, তিনি যখন মুসলমানদের সাধনার কথা বলছেন তখন আসলে বলছেন সুফীদের সাধনমার্গের কথা, যা বস্তুগত অর্থে হিন্দুদের ত্যাগবৈরাগ্য ভিত্তিক সাধনপ্রণালীর বিশেষত্বে মণ্ডিত। ইহকাল ও পরকালে ভোগসুখই চরম উদ্দেশ্য, আল্লা পুরুষদের ভোগের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছেন, যদি কিতাব, রসুল ও আল্লাতে ইমান ঠিক থাকে, তাহলে ইহলোকে এবং স্বর্গেও অনন্ত ভোগসুখ পাওয়া যাবে, নতুবা নরকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে—এই ধরনের তত্ত্ব সমন্বিত, ভোগবাদ ভিত্তিক, জেহাদ ভিত্তিক ইসলামের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেননি। কারণ, ভোগবাদের পথ ত্যাগপূত সাধনার পথ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ভোগের পথে ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা অচিন্তনীয়। সত্যিকারের সুফী সাধকগণ রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্যসহ সাধনভজন, জপধ্যান, হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি করেন এবং ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন। এঁরা অধ্যাত্ম জগতের পথিক। ভগবানকে পাওয়াই এঁদের উদ্দেশ্য। এঁরা ঈশ্বরকে আল্লা নামে ডাকলেও সেই এক সচ্চিদানন্দকেই প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের কথাই বলেছেন মুসলমান ধর্মের কথা বলতে গিয়ে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে দেখা যায় দুটি বিভাগ। একটি ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং দ্বিতীয়টি নিউ টেস্টামেন্ট। ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং কোরানের মধ্যে প্রভূত পরিমাণ সাদৃশ্য রয়েছে। মূর্তিপূজা পাপ এবং ঐ সব মূর্তিপূজকরা নরকে যাবে। স্বর্গ চরম ও অনন্ত সুখ ভোগের স্থান। নরক চরম ও অনন্ত যন্ত্রণা ভোগের স্থান। ঈশ্বরকে পাওয়ার

জন্য অধ্যাত্মপথের কথা সেখানে নেই। নিউ টেস্টামেন্টে যীশু তাঁর নিজস্ব সাধনার দ্বারা লব্ধ কিছু উপলব্ধির কথা বলেছেন। তাঁর বহুবিধ সিদ্ধাই শক্তিরও প্রকাশ ঘটেছে, যার বর্ণনা সেখানে রয়েছে। কারণ, যীশুর ছিলেন এসেনী সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা ছিলেন ঈশান বা শিবের উপাসক, সাধনার কিছুটা ছিল হিন্দুমতের সদৃশ। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন—যীশু ভারতীয় নাথ যোগীদের সদৃশ। ঈশান থেকে ঈশা নামের উদ্ভব এবং যীশুর ঈশা নামে পরিচিতি। আবার তিব্বতের হিমিশ নামক গুহায় যীশুর সাধনা করার বিষয়ে ও ভারতে আগমন বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতে ছিল ভগবান বুদ্ধের মতের প্রভাব।

যাইহোক, সমগ্র বাইবেল ভিত্তিক খ্রিষ্টান মতকে মানতে গেলে দেবদেবীকে মানা চলে না। সেখানে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা, ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা, অধ্যাত্ম পথের কথা বা যোগের কথা নেই। ইহলোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বর্গেও অনন্ত সুখলাভ জীবনের উদ্দেশ্য। একমাত্র প্রফেট ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগ অন্য কারও হতে পারে না। সাধারণদের জন্য মূল নির্দেশ পাপ স্বীকার ও প্রার্থনা। ত্যাগ এবং ভোগ দুটি বিপরীত মেরু। ইসলামের মতই খ্রিষ্টানদেরও মূল লক্ষ্য ভোগ। হিন্দুর মূল লক্ষ্য ত্যাগ। কারণ, ত্যাগের মাধ্যমেই পাওয়া যায় সেই পরম বস্তুকে।

অতএব খ্রিষ্টান সাধনার নামে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বোঝাচ্ছেন, তা কিন্তু তাঁর নিজস্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য ও কঠোর তপস্যাপূত সাধনা-যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে কিংবা চিন্ময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পাওয়া। এই উদ্দেশ্য এবং সাধনা উভয়ই হিন্দুমতের সাধনা ও সাধ্য—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' উক্তিকে যথার্থ মূল্যায়ন সহকারে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঐ বাণী প্রচারের সময় যথেষ্ট সতর্কতার আবশ্যকতা রয়েছে। নইলে ঐ বাণীর তাৎপর্য বিকৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে।

'যত মত তত পথ' বাণীটির বিষয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের একটি উল্লেখযোগ্য পত্র রয়েছে। কাশী থেকে ১৮ এপ্রিল, ১৯১৯ শর্বানন্দজীকে লেখা উদ্বোধনে প্রকাশিত সেই পত্রের মূল অংশ এইরূপ :

''ঠাকুরের মত বলা বড় সহজ নয়। আমার মনে হয় সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, 'যত মত তত পথ'।"

সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সত্যে পৌঁছানো যায় অনুভব করে, তবে পূর্বের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, যাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়।

যিনি ঐ সত্য (Truth) উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি উহা নিজের সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে বিশেষ নাম দিয়াছেন।

কিন্তু কেহই 'পরিপূর্ণ সমগ্র সত্য' কি তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। 'তিনি যাহা, তিনি তাহাই'—এই মনোভাবই উপলব্ধিবান ব্যক্তিসকলের চরম সিদ্ধান্ত।

অবস্থাবিশেষে গৌড় পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, রামানুজের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ সকলেই সত্য।

আবার এ সকল ছাড়া তিনি অবাঙ্মনসগোচরম্। ঐ সকল মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ (প্রবর্তকগণ) তপস্যা করিয়াছেন এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্তু তিনি বাদবিচারের পারে। এই সভাটি প্রচার করাই যেন ঠাকুরের মত বলিয়া মনে হয়।

দেহবুদ্ধ্যা দাসোহস্মি, জীববুদ্ধ্যাত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং, ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।

ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলিয়া বলিতেন। আর চিন্ময় কোলাকুলি কেন হবে না?

'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'—তিনি ভিন্ন তো কিছুই নাই, সবই তো তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য জিনিস দেখি—নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো তাঁ থেকেই এবং তাঁতেই! তরঙ্গ, ফেনা, বুদবুদ্—জল ছাড়া তো কিছুই না। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর যাক।

এ সত্য যে দেখেছে, সে আর মিথ্যা বলতে পারে না। তবে ঠাকুরের এমন অবস্থা হয়ে যেত, যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন। তখন নামরূপ থাকত না, তার পারে যেতেন। সে অবাঙ্মনসগোচর অবস্থা। তখনও সেই একই আছেন—অদ্বৈত, আর কিছু নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

এক অসাধারণ পদচারণা : ভগবান বুদ্ধ

রবিব্রত ঘোষ

কোন ভনিতা না করেই আজ আমরা এক মহান ব্যক্তির পদচারণার কথা স্মরণ করব। মনে হল মানুষের মহা মুক্তির পথ তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তাকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। মানুষকে জানানো দরকার—কিন্তু কাকে জানাবেন, কে বুঝবে এই দুর্বোধ্য জ্ঞান? প্রথমেই মনে হল ফেলে আসা সেই গুরুদের কথা। তারপরেই বুঝতে পারলেন তারা কেউ এখন জীবিত নেই। এবার মনে পড়ল সেই পঞ্চসাথীর কথা, যারা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। অনুভব করলেন তারা সেখান থেকে রয়েছে অনেক দূরে। এক নতুন সংকল্প নিলেন। এই নতুন বার্তা নিয়ে তিনি হাজির হবেন সেই পঞ্চ সাথীর কাছে।

এই জীবনের শুরুর সময় তিনি বিরাট বড় পথ পায়ে হেঁটে ছিলেন। এক অজানা পথ আবিষ্কার করার চেষ্টায়। রাজপুত্র সিদ্ধার্থর যাত্রা ছিল একজন জিজ্ঞাসুর যাত্রা। আর তথাগত বুদ্ধের যাত্রা এক তত্ব জ্ঞানীর যাত্রা। মানব মুক্তির সন্ধানে নববার্তা দেওয়ার জন্য।

এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এক নির্দিষ্ট বার্তা নিয়ে। মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য রকমের পদযাত্রা। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এখন পরিণত হয়েছেন তথাগত বুদ্ধে। এবার তার পদযাত্রা শুরু হল বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথ অভিমুখে।

সারনাথে বসবাস করা পঞ্চসাথী তাকে যোগ্য সমাদর দিলেন না। তথাগত তাদের কাছে আত্ম উন্মোচন করলেন। খুব সহজ এবং দৃঢ় ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি সেই পুরনো সাধক নন, পুরনো জিজ্ঞাসু নন। তিনি এখন তত্ত্বজ্ঞানী। মানব মুক্তির তার জানা হয়ে গেছে। তিনি তাকে উপলব্ধি করেছেন। তথাগত এসেছেন তাদের সহচর্য দিতে নয়। তথাগত এসছেন তাদেরকে পথ দেখাতে, তাদের গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হতে।

এরপর থেকে শুরু হল তথাগতর এক নিরন্তর পথ চলা। ভারতবর্ষের মানুষ লক্ষ করল এই পথ চলা, যাবতীয় বিধি নিষেধ সামাজিক রীতিনীতিকে রীতিমতো উলঙ্ঘন করা। জাতপাতের তীব্র বন্ধনে বেঁধে থাকা সমাজকে তিনি ভালোবাসার অস্ত্রে ভেঙে দিলেন। তথাগত শিষ্য তালিকায় তাই যেমন রাজপুরুষেরা ছিলেন, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষেরাও ছিলেন আবার পিছিয়ে পড়া মানুষেরাও ছিলেন। এমনকি নগর নটীরাও ছিলেন, যাদেরকে সমাজ মোটেই ভালোভাবে দেখত না। আসলে সমাজকে এভাবে কাছে আনা যায়, মানুষের পাশে এভাবে দাঁড়ানো যায় এই ধারণাটা সমকালীন সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তথাগত জানতেন জীবনের যন্ত্রণা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই রয়েছে। জাতি কুল শীল অনুসারে তা আলাদা আলাদা রকমের নয়।

মানুষের জীবনের যন্ত্রণা মানুষের সার্বজনীন সর্বকালীন সমস্যা। সেই যন্ত্রণা উপশমের সন্ধান জানতেন তথাগত। অসাধারণ প্রেমিক, অসাধারণ হৃদয়বান দেব মানব হিসেবে তথাগত আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের কাছে।

তার করুণার স্পর্শে জেগে উঠেছিল গোটা চরাচর। শুধু মানুষ নয় তথাগত করুণা স্পর্শ পেয়েছিল পশু পাখিরাও। হত্যা করতে যাওয়া হরিণ শিশুকে বাঁচাতে নিজের মাথাটা এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই সারনাথ উত্তর তথাগতর জীবন এক আশ্চর্য পদচারণার জীবন। মানুষকে কাছে ডাকছেন বা বলা যেতে পারে যাবতীয় বন্ধন ভেদ করে মানুষ তার সামনে হাজির হচ্ছেন, তিনি তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনের সন্ধান দিচ্ছেন।

পিতা বিম্বিসার খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে তার পুত্র এখন তথাগতে পরিণত হয়ে, এক নতুন ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত আছেন। রাজধানী থেকে একের পর এক দুত পাঠালেন তার কাছে তাকে অন্তত একবার কপিলাবস্তুতে আনার জন্য।

শেষমেষ তথাগত তার ২০০০ শিষ্যকে নিয়ে কপিলাবস্তুতে এলেন। রাজধানীর মানুষ দেখল এক আশ্চর্য জিনিস তাদেরই প্রিয় রাজপুত্র আজ রাস্তায় ভিক্ষা করছেন। আপত্তি জানিয়ে শুদ্ধোধন বলেছিলেন যেটা রাজবংশের ঐতিহ্য নয়। তথাগতে পরিণত হওয়া পুত্র সিদ্ধার্থ তাকে বলেছিলেন এই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঐতিহ্য অতীতের জ্ঞানী বুদ্ধদের ঐতিহ্য। কোন রাজ পরিবারের ঐতিহ্য নয়। এটাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এখন তথাগত বুদ্ধে পরিণত হয়েছেন। সিদ্ধার্থের রাজ পরিবারের ঐতিহ্য

আছে, কিন্তু তথাগতে রয়েছে বুদ্ধ পরিবারের ঐতিহ্য।

পুত্র রাহুলকে পাঠানো হয়েছিল বুদ্ধের কাছে। রাহুল গিয়ে বলেছিল আমাকে পিতৃধন দাও। বুদ্ধ দ্রুত তাকে প্রবজ্যা দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধের কাছে বুদ্ধত্ব ছাড়া আর কোন জাগতিক ধন নেই। নগর বাসী অবাক হয়ে দেখেছিল বুদ্ধের আরেক পদযাত্রা, যেখানে তার পুত্রও তার যাত্রার সহযাত্রী।

এরও কয়েক বছর পরে বুদ্ধ হেঁটে চলেছেন এক নগর থেকে আরেক নগরে। পথে পড়েছিল এক বন। সেই বনে নাকি এক ভয়ংকর দস্যু অঙ্গুরীমালের বাস। সে এক ভয়ঙ্কর দস্যু যার এক ভয়ংকর শপথ রয়েছে। মানুষ ধরো, তাকে হত্যা কর, তারপর তোর আঙুলটা কেটে গলায় মালার মতো করে পড়ে নাও। অনেকেই আপত্তি করেছিলেন বুদ্ধকে এই একক পথ যাত্রায়। কিন্তু বুদ্ধ কারো কথাই শোনেননি।

পথে সেই ভয়ংকর দস্যুর সঙ্গে বুদ্ধর সাক্ষাৎ হয়েছিল। অঙ্গুরিমাল তাকে থামতে বলেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ তার পদযাত্রা বন্ধ করেননি। ধীরে শুরু হয়ে থেকে দ্রুত লয়ে পরিণত হয়েছিল অঙ্গুরিমালের পদযাত্রা, বুদ্ধকে ধরার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে বুদ্ধের পেছনে দৌড়াতে হয়েছে। তাই যখন সাফল্য আসেনি তখন অঙ্গুরিমাল চিৎকার করে বলেছিল, থামো! বুদ্ধ শুনেছিলেন থেমে। উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তো থেমেই আছি এবার তুমি থামো। এই থামা, কোন জাগতিক থামা নয় একজন মানুষের আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষের থামা। থেমে দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ চলা। করুণা পাথার বুদ্ধের অসীম করুণায় সেই আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল দস্যু অঙ্গুরিমাল পরিণত হয়েছিল বৌদ্ধ শ্রবণে। আসুরিক প্রবৃত্তি দূর হয়ে গিয়ে জীবনের স্থান করে নিয়েছিল ভালোবাসা ও করুণা।

বুদ্ধের জীবন মানবমুক্তির সন্ধানে মানুষের স্বার্থে উৎসর্গীকিত এক পথ চলা। যার গোটা জীবন জুড়েই রয়েছে এক পবিত্র পদচারণার পদচিহ্ন। যেখানে যেখানে যাকে যাকে স্পর্শ করেছ, সেখানেই যাবতীয় আসুরিক প্রবৃত্তি দূর করে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দেব মানব। ■

পরিষদ বার্তা

‘সর্বব্যাপী হিন্দুত্ব’ অনুষ্ঠান পালন

গত ১লা এপ্রিল বুধবার সল্টলেকস্থিত EZCC-এর ঐকতানের হলে সর্বব্যাপী হিন্দুত্ব নামক অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী শ্রীমিলিন্দ পারান্ডে, ক্ষেত্র সম্পাদক শ্রীঅমিয় সরকার, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্রীসোহান সিং সোলাঙ্কি, প্রান্ত সভাপতি শ্রীসুবীর সান্যাল, সহ সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, শ্রীমতি বর্ণালী ব্যানার্জি, প্রান্ত সম্পাদক শ্রীচন্দ্রনাথ দাস, প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী শ্রীমানিকচন্দ্র পাল, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী শ্রীবিজয় পাতর তথা অন্যান্য ক্ষেত্রীয় ও প্রান্তের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক তথা বিশ্ব হিন্দু বার্তার সম্পাদক অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস এবং দীপককুমার চৌধুরীর আমন্ত্রণে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের গবেষক, অধ্যাপকদের সমাবেশ করা হয় সেখানে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সনাতনী হিন্দুদের উপর নানা রকম বৌদ্ধিক আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য, এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় এবং স্থির করা হয়, যে জাতীয়তাবাদী গবেষকরাও সনাতনীদের বিরুদ্ধে তোলা ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার এবং সনাতনীদের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আগামী দিনে সংঘবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসবে। এই অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. দেবাশীষ চ্যাটার্জী প্রাক্তন প্রান্ত সভাপতি তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে হিন্দুত্বের একটি সম্পূর্ণ ও ভাবগম্ভীর ধারণাকে তুলে ধরেন। এছাড়া প্রফেসর অনিকেত মাহাতো, প্রফেসর শ্রীঅয়ন ব্যানার্জি, প্রফেসর শ্রীস্বরূপপ্রসাদ ঘোষ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত বিজ্ঞবান মানুষদেরকে হিন্দুত্বের উপর নানা ধরনের ঘাত প্রতিঘাত হানা হচ্ছে, তার সম্পর্কে তথ্যসহ বিবরণ তুলে ধরেন। সম্মেলনটি ১০:৩০টা থেকে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত প্রথম পর্বের পরে ভোজন বিরতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্ব দুপুর ২:০০টো থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত চলে। সমাপণ ভাষণে মাননীয় মিলিন্দজি উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান যে, এই কাজে যারা নিজেদের সময় দিতে প্রস্তুত, তারা যেন এগিয়ে আসেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষিকা শ্রীমতি সুকন্যা রায়। সবার শেষে একটি সাংবাদিক সম্মেলনও করা হয় মাননীয় মিলিন্দজির উপস্থিতিতে।

চৈত্র নবরাত্রি ও তার তাৎপর্য

অর্পিতা বোস

সহজ করে বললে নয়টি রাত জুড়ে যে উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে, তাকেই বলা হয় নবরাত্রি। আর তার আগে জুড়ে থাকা চৈত্র শব্দটি, কোন সময়ে এই উৎসব উদযাপিত হয়, তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। চৈত্র মাসের উৎসব বলে একে বলা হচ্ছে চৈত্র নবরাত্রি। আবার, এই চৈত্র মাস যেহেতু বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত, সেই সূত্রে এই উৎসবকে বসন্ত নবরাত্রিও বলা হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হয়ে নবমী তিথি পর্যন্ত চলা এই উৎসবটি দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, যেখানে নয় দিন ধরে দেবী দুর্গার নয়টি রূপের বন্দনা করা হয়। শেষ দিনটি হল শ্রীরামের জন্মদিন, অর্থাৎ রাম নবমী। এই কারণে, এটিকে রাম নবরাত্রিও বলা হয়।

তাত্ত্বিকভাবে, ঋতুভিত্তিক চারটি নবরাত্রী রয়েছে। যথা—

১) শারদ নবরাত্রী : শারদ নবরাত্রি হল চারটি নবরাত্রির মধ্যে সর্বাধিক পালিত, যার নামকরণ করা হয়েছে শারদ যার অর্থ শরৎ। এটি শরৎকালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে (প্রতিপদ) শুরু হয়।

২) মাঘ নবরাত্রি : মাঘ মাসের (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) চন্দ্র মাসের সময় পালিত হয়। এই উৎসবের পঞ্চম দিনটি প্রায়শই বসন্ত পঞ্চমী নামে পালিত হয় , যা হিন্দু ঐতিহ্যে বসন্তের আনুষ্ঠানিক সূচনা, যেখানে দেবী সরস্বতীকে পূজা করা হয়।

৩) আষাঢ় নবরাত্রি : এই নবরাত্রি গুপ্ত নবরাত্রি নামেও পরিচিত। বর্ষা ঋতুর শুরুতে আষাঢ় মাসের (জুন-জুলাই) সময় পালিত হয়। আষাঢ় নবরাত্রি আঞ্চলিকভাবে বা ব্যক্তি পর্যায়ে পালন করা হয়।

৪) চৈত্র নবরাত্রি : চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) পালিত একটি নয় দিনব্যাপী উৎসব। এটি বছরের দ্বিতীয় প্রধান নবরাত্রি, যা শক্তির আরাধনা, উপবাস এবং আত্মশুদ্ধির জন্য পরিচিত। এই চৈত্র নবরাত্রি আজ আমাদের আলোচ্য।

চৈত্র নবরাত্রির শিকড় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর গভীরে নিহিত। শারদীয়া দুর্গাপূজার মতো এই উৎসবেরও নেপথ্যে রয়েছে দেবীর মহিষাসুর বধের কাহিনি। পুরাণ অনুসারে, ভগবান ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন যে, মহিষাসুরকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের কোন পুরুষ মারতে পারবে না, তবে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে এক নারীর হাতে। ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা প্রায় অমরতা লাভ করে দৈত্যরাজ মহিষাসুর বিশ্বকে আতঙ্কিত করে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল দখল করে নিয়েছিলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অতঃপর, দুর্দান্ত অসুরকে পর্যুদস্ত করতে দেবতারা সম্মিলিত হন এবং তাঁদের তেজ থেকে জন্ম নেন দশভুজা দুর্গা, যিনি দৈবী অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে সিংহপৃষ্ঠে সমরে অবতীর্ণ হন। তিনি একটানা ৯ দিন, ৯ রাত ধরে মহিষাসুরের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত দশম দিনে অসুরকে পরাজিত করেছিলেন। এই দিনটিতে তাই দেবীর উপাসনা হয় অপরাজিতা রূপে, অর্থাৎ যিনি যুদ্ধে কখনই পরাজিত হন না।

চৈত্র নবরাত্রিতে, দেবী দুর্গা ৯ দিনে, যে নয়টি রূপ ধারন করে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই নয়টি রূপের পূজা করা হয়। প্রতিটি দিন দেবীর একটি নির্দিষ্ট রূপের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং ভক্তরা দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, আচার-অনুষ্ঠান করেন। অনেক ভক্ত তাদের মন ও শরীরকে পবিত্র করার জন্য উপবাস পালন করেন এবং প্রার্থনা ও ধ্যানে নিযুক্ত হন। লোকেরা নানা বাধা অতিক্রম করে তাদের জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য দেবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই সময়ে মন্ত্রপাঠ, আরতি, এবং দেবী মহাত্ম্যের পাঠ করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

এই নবরাত্রির প্রথম দিনটি অনেক স্থানে ঘটস্থাপন বা কলশ স্থাপন দিয়ে শুরু করা হয়। ভক্তরা বাড়ি বা মন্দিরে পবিত্র ঘট স্থাপন করে দেবীর আহ্বান করেন। এই নয় দিনে দেবী দুর্গার নয়টি রূপ, যথাক্রমে—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী—এর পূজা করা হয়। দেবীর এই নয়টি রূপের তাৎপর্য হল—

১. নবরাত্রির প্রথম রাতে, অর্থাৎ প্রথমা তিথিতে উপাসনা করা হয় দেবী শৈলপুত্রীর। তিনি শৈল অর্থাৎ পর্বতের কন্যা এবং ভগবান শিবের সহধর্মিণী। তিনি শক্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতীক।

২. দ্বিতীয়া তিথিতে পূজিতা হন দেবী ব্রহ্মচারিণী। তিনি জ্ঞান ও তপস্যার প্রতীক এবং যিনি সাধনা ও সংযম শেখান।

৩. তৃতীয়া তিথি দেবী চন্দ্রঘণ্টার উদ্দেশে নিবেদিত, কপালে অর্ধচন্দ্রধারী, শান্তি ও শক্তির প্রতীক, যিনি ভয় ধ্বংস করেন।

৪. চতুর্থী তিথিতে পূজা হয় দেবী কুষ্মাণ্ডার। তিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক শক্তির প্রতীক।

৫. পঞ্চমী তিথিতে আরাধনা হয় দেবী স্কন্দমাতার, যিনি কার্তিকের মাতা। এই রূপে মা তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন।

৬. ষষ্ঠী তিথিতে আরাধনা হয় দেবী কাত্যায়নীর, তিনি মহিষাসুরমর্দিনী, দুষ্টের দমন ও বীরত্বের প্রতীক।

৭. সপ্তমী তিথিতে উপাসনা করা হয় দেবী কালরাত্রির, যিনি অন্ধকার ও অজ্ঞতা বিনাশকারী, সাহসী ও উগ্র রূপ।

৮. অষ্টমী তিথিতে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় দেবী মহাগৌরীকে, যিনি পবিত্রতা ও করুণার প্রতীক এবং তিনি ভক্তের পাপ মোচন করেন।

৯. নবমী তিথিতে আরাধনা হয় দেবী সিদ্ধিদাত্রীর—তিনি জ্ঞানের রূপ। আমাদের সর্ববিধ সাফল্যে পরিপূর্ণ করেন এবং অলৌকিক ক্ষমতা প্রদানকারী।

দেবীকে এই নয়রূপের উপাসনার রীতি দেশের কিছু অংশে চোখে পড়ে, যেমন, উত্তর ভারতে, মধ্য ভারতে আর দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে। যদিও দেশের পূর্ব দিকে দেবীর নয়টি রূপের উপাসনার বিধি নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসব বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে বিখ্যাত। এখানে ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত সায়ুধবাহনে (অস্ত্রধারী সিংহ-বাহিনী) সপরিবারে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। এছাড়া এই বসন্ত নবরাত্রির নবমী তিথিতে বঙ্গে এবং দেশের কিছু অংশে দেবী অন্নপূর্ণার পূজাও প্রচলিত আছে।

মহারাষ্ট্রীয়রা এই নবরাত্রির প্রথম দিনটিকে গুড়ি পদওয়া হিসেবে উদযাপন করে এবং কাশ্মীরে এটিকে নবরেহ বলা হয়, যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং অন্যান্য দক্ষিণভারতীয় রাজ্যে এটি উগাদি হিসেবে পালিত হয়। দেশের বাইরেও এই কোন কোন দেশে এই উৎসব পালনের রীতি আছে। যেমন—নেপালে এই উৎসব দশাইন নামে পরিচিত।

চৈত্র নবরাত্রির ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি এর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। এই উৎসব মানুষকে আত্মসংযম, শুদ্ধতা ও ইতিবাচক শক্তির পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। দেবীর শক্তির আরাধনার মাধ্যমে ভক্তরা জীবনের বাধা দূর করার এবং সুখ-সমৃদ্ধি লাভের প্রার্থনা করেন। মানুষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, মিষ্টি এবং উপহার বিনিময় করে এই উৎসব উদযাপন করতে একত্রিত হয়। এই উৎসব পরিবার এবং বন্ধুদের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং মানুষকে তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের আরও কাছে নিয়ে আসে।

সব মিলিয়ে, চৈত্র নবরাত্রি কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি ভক্তি, শৃঙ্খলা, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির এক অনন্য প্রতীক। প্রতি বছর ভক্তরা গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে এই পবিত্র উৎসব পালন করেন। এই বছর, চৈত্র নবরাত্রি শুরু হবে ১৯ মার্চ, ২০২৬ এবং শেষ হবে ২৭ মার্চ, ২০২৬। আশা করি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মহা সমারোহে দেশজুড়ে এই উৎসব পালিত হবে। ■

রামনবমী শোভাযাত্রা, হুগলী জেলা, মধ্যবঙ্গ

‘পয়লা বৈশাখ’ বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম দিন

সরোজ চক্রবর্তী

‘পয়লা বৈশাখ’ বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম মাসের প্রথম দিন। এই দিনটি বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। এটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন উৎসব হিসেবেও বিবেচিত। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৪ ই এপ্রিল অথবা ১৫ এপ্রিল ‘পহেলা বৈশাখ’ পালিত হয়। আধুনিক বা প্রাচীন যে কোনও পঞ্জিকাতেই এই বিষয়ে মিল পাওয়া যায়।

হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস অনেককাল আগে থেকেই পালিত হয়। এই সৌরপঞ্জিকা শুরু হত গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। হিন্দু সৌর বছরের প্রথম দিন বাংলা, আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, নেপাল, কেরল, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য সহ বাইরের নানা স্থানে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে অনেক আগে থেকেই পালিত হত। এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার জন্য পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, অতীতে এমনটি ছিল না। তখন নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ ‘আর্তব উৎসব’ তথা ‘ঋতুধর্মী’ উৎসব হিসেবে পালিত হত। সেই সময় এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। কারণ প্রযুক্তিগত উন্নতি ও প্রয়োগ শুরু না হওয়ায় কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হত।

পশ্চিমবঙ্গে মহাসমারোহে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় ‘বাংলা নববর্ষ’ তথা ‘পয়লা বৈশাখ’। বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিতে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে সমগ্র পশ্চিমবাংলায়। বাংলার গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মেলবন্ধন সাধিত হয়ে সকলে একসূত্রে বাঁধা পড়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আনন্দে। সারা চৈত্র মাস জুড়েই চলতে থাকে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন পালিত হয় ‘চড়কপূজা’ অর্থাৎ শিবের উপাসনা। এই দিনেই সূর্যদেব মীনরাশি ত্যাগ করে মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত হয় চড়ক মেলা। এই মেলায় অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করে ব্রত পালন করে থাকেন। বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় ‘গাজন’। ভক্তদের এই শারীরিক কসরৎ দেখাতে মানুষের ঢল নামে।

বর্ষশেষের দিন বাঙালির বহু পরিবারে ‘টক’ এবং ‘তিতো’ ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে সম্পর্কের সকল তিক্ততা ও অম্লতা বর্জন করার প্রতীকী প্রথা একবিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান। পরের দিন অর্থাৎ ‘পয়লা বৈশাখ’-এ প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা প্রাতঃকালে স্নান সেরে দেব-দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে মিষ্টান্ন ভোজন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই এই দিন থেকেই তাদের ব্যবসায়িক হিসাবের নতুন খাতা উদ্বোধন করে থাকে, যাকে বলা হয় ‘হালখাতা’। গ্রামেগঞ্জে এবং কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে পহেলা বৈশাখ থেকে আরম্ভ হয় ‘বৈশাখী মেলা’। এই মেলা সমগ্র বৈশাখ মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় নানা সংগঠনের উদ্যোগে প্রভাতফেরী আয়োজিত হয়। চৈত্র মাসে দোকানে কেনাকাটার উপরে দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ ছাড়, যার প্রচলিত নাম হল ‘চৈত্রসেল’। তাই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এবং এই ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করতে অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাজারে মানুষজন একমাস ধরে নতুন জামা কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে থাকেন।

পয়লা বৈশাখের দিন উল্লেখযোগ্যভাবে ভিড় দেখা যায় কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর সহ বাংলার বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে। সেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ভোর থেকে প্রতীক্ষা করে থাকেন দেব-দেবীকে পুজো নিবেদন করে ‘হালখাতা’ আরম্ভ করার জন্য। ব্যবসায়ী ছাড়াও বহু গৃহস্থও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে দেব-দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে মন্দিরে গিয়ে থাকেন। এই দিন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পোশাক ধুতি, পাজামা, পাঞ্জাবী এবং শাড়ি পরার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। আসলে বাঙালি হিন্দুর মনেপ্রাণে যে ধর্ম বাসা বেঁধে আছে, এই সব উৎসব তারই

প্রমাণ দেয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্রিয়াকর্মেই হিন্দুরা স্মরণ করে থাকেন তাঁদের আরাধ্য ঈশ্বরকে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-শোক জীবনের প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি ভাবনা চিন্তা অথবা প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে ধর্ম, রয়েছেন ঈশ্বর। তাই প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগেই হিন্দুরা ভক্তি সহকারে দেবতার আরাধনায় মেতে ওঠেন।

এদিক থেকে বলা যায়, পুজো প্রার্থনা হোমযজ্ঞ রয়েছে হিন্দুর নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে। আর সেই কারণেই পয়লা বৈশাখ ও নববর্ষের দিনে হিন্দুরা মেতে ওঠেন নানা পুজো বা যাগযজ্ঞে। নববর্ষে বঙ্গদেশে যেসব দেব-দেবীর পূজা হয় তার মধ্যে রয়েছে গণেশ-লক্ষ্মী ও মা ভগবতীর আরাধনা। এছাড়া গৃহদেবতা বা গৃহদেবীর বিশেষ পুজো এই দিনে হয়ে থাকে। গৃহদেবতা বা গ্রাম্য দেবতা হিসাবে শিব, কৃষ্ণ, গোকুলচাঁদ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, ধর্মরাজ, ধর্মঠাকুর, গোপাল প্রভৃতির পূজা হয়। আবার গৃহদেবী, কুলদেবী বা গ্রাম্যদেবী হিসেবে মা চণ্ডী, শীতলা, মনসা মাতারও পুজোর আয়োজন করা হয়। যাই হোক হিন্দুর উপাস্য দেবদেবীর সংখ্যা বড় কম নয়।

এই পুজোর দিনে দেবতা বা দেবীর অভিষেকের মাধ্যমে নতুন শস্য দিয়ে তৈরি বিভিন্ন উপাচারে ভোগ নিবেদন করা হয়। তবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বেশি গুরুত্ব পায় লক্ষ্মী-গণেশ পুজো। গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। যে কোন দেবতারই পুজোয় প্রথম গণেশের পূজা করা হয়। সে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব কিংবা গৌড়ীয় যে সম্প্রদায়েরই পুজোর আয়োজন করা হোক না কেন, সকলের শুরুতেই গণেশের আরাধনা করতে হয়। ব্যবসায়ীরাও তাদের ব্যবসার সর্বসিদ্ধি লাভের আশায় নববর্ষের এই শুভদিনে গণেশ পুজো করে 'হালখাতা' বা ব্যবসায় নতুন হিসাব খাতা সূচনা করেন। ওই 'হালখাতা'য় সিঁদুর দিয়ে 'গণেশায় নমঃ' লিখে টাকার ছাপ ও স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা হয়।

গণেশের মতোই নববর্ষের প্রথম দিনে লক্ষ্মীপুজো করা হয়ে থাকে। লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী'। লক্ষ্মী অপূর্ব সুন্দরী এবং সমৃদ্ধি ও সম্পদের দেবী। তিনি পদ্মাসনা বা পদ্মহস্তা। সাধারণত দুটি বা চারটি হাত, কখনও বহু বাহু লক্ষ্মীর সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণত লক্ষ্মী হলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তবে চন্দ্রপ্রভার মতো শ্বেতবর্ণা লক্ষ্মীরও ধ্যানমন্ত্র রয়েছে। লক্ষ্মী হলেন সৌন্দর্যের প্রতীক। ধন সম্পদের দেবী হিসেবে লক্ষ্মীমাতার আরাধনা করা হয়, যাতে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাওয়া যায়। সেই কারণেই ব্যবসায়ী ও কারবারিরা আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য পহেলা বৈশাখে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করে থাকেন।

পয়লা বৈশাখের দিন বাংলার গৃহস্থরা অনেকেই ভগবতীর পুজা-অর্চনা করে থাকেন। গরুকে কল্পনা করা হয় মাতা ভগবতী হিসেবে। এই কারণেই এদিন গোয়াল পরিষ্কার করে গরুকে ভালো করে তেল হলুদ দিয়ে স্নান করিয়ে গৃহস্থ ভগবতীমাতার পুজো করে থাকেন। সব মিলিয়ে পহেলা বৈশাখ হিন্দুর জীবনে শুধু একটি দিন নয়, সকলের কাছে মঙ্গল ও শ্রী'র প্রতীক।

আধুনিক ভারতের নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে পহেলা বৈশাখে হোম-যজ্ঞ, কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ এই রকমই কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালেও ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়, তবে এই উৎসব সেভাবে জনপ্রিয় হয়নি। বহু ঐতিহাসিক বাংলা দিনপঞ্জি উদ্ভবের কৃতিত্ব আরোপ করেছেন সপ্তম শতকের রাজা শশাঙ্কের উপর। পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট আকবর এটিকে রাজস্ব কর আদায়ের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করেন। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাট হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরী সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষিপণ্যের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদের খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হত। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা আনার জন্য মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।

বাংলা চৈত্রমাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করার নিয়ম চালু ছিল। এরপরের দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, যার রূপ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তবে বাংলা দিনপঞ্জি অস্তিত্ব আকবরের সময়ের পূর্বেও ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, 'পয়লা বৈশাখ' উৎসব ঐতিহ্যগত হিন্দু নববর্ষ উৎসবের সাথে সম্পর্কিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একই

দিনে এই উৎসব পালিত হয় যা বৈশাখী নামে পরিচিত। ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের নববর্ষের উৎসবগুলো হিন্দু 'বিক্রমী দিনপঞ্জি'-র সাথে সম্পর্কিত। খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্যের নাম অনুসারে এই দিনপঞ্জির নামকরণ করা হয়েছে। তবে বাংলায় বঙ্গাব্দের সূচনা ৫৭ খ্রিস্টপূর্বে হয়নি। বরং ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল রাজা শশাঙ্কের শাসনকাল থেকে।

বাংলা নববর্ষ তথা 'পহেলা বৈশাখ' পালনের সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'নববর্ষ' প্রবন্ধে লিখেছেন 'অহোরাত্রান্যার্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি' অর্থাৎ 'যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া দিন ও রাত্রি, পক্ষ ও মাস, ঋতু ও সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃ সূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববর্ষের আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন এই প্রবন্ধে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছেন 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। নানা জ্বালা যন্ত্রণা সংকটের মধ্যেও বাঙালি হিন্দুর জীবনে নববর্ষের এই দিন ধর্মীয় ও আনন্দের আবহে শঙ্খধ্বনির আহ্বানে তাই হয়ে ওঠে শুভ ও মঙ্গলময়। ■

বহু উদ্দেশ্যই পর্ব অক্ষয় তৃতীয়া

আদিত্য দেব

ভারতবর্ষ সংস্কৃতি প্রধান দেশ। হিন্দু সংস্কৃতিতে ব্রত এবং উৎসবগুলোর বিশেষ গুরুত্ব আছে, এর মাধ্যমে নতুন প্রেরণার সঞ্চার হয়। মুনি, ঋষিরা ব্রত ও উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট হবার থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় কাল গণনা অনুসারে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ (গুড়ি পরোয়া), অক্ষয় তৃতীয়া (আঘাতীজ), দশহরা এবং দীপাবলির পূর্বের প্রদোষ তিথিকে স্বয়ংসিদ্ধ অভিজিৎ মুহূর্ত বা তিথি বলা হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিকে অক্ষয় তৃতীয়া বলা হয়। পৌরাণিক গ্রন্থ অনুসারে ওই দিনে যে কোন শুভ কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে, যেমন—গৃহপ্রবেশ, বিবাহ, আভুষণ ক্রয়, জমি কেনা, বাহন কেনা, নতুন বস্ত্র কেনা ইত্যাদি। পুরাণে বলা হয়েছে, এই দিন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে পিণ্ডদান কিংবা বস্তু দান করলে অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হয়। এই দিনে গঙ্গা কিংবা কোন পবিত্র নদ-নদীতে স্নান করলে, ভগবত পূজা করলে সমস্ত পাপের বিনাশ হয়। আবার বলা হয়, এই দিনে মানুষ নিজের দ্বারা কিংবা স্বজনের দ্বারা কৃত অপরাধগুলোর জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে, ভগবান তা ক্ষমা করে সদগুণ প্রদান করে থাকেন। মান্যতা আছে, এই দিন দান করা বস্তু মানুষ স্বর্গে কিংবা পুনর্জন্মে প্রাপ্ত করে থাকেন। এই দিন ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং মাতা লক্ষীর পূজা শ্বেত কমল এবং শ্বেত গোলাপ দ্বারা করলে মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হয়।

অক্ষয় শব্দের অর্থ হচ্ছে, যার কোন ক্ষয় নেই অর্থাৎ নাশ হয় না, কিংবা যা স্থায়ী থাকে। আবার স্থায়ী কেবলমাত্র সত্যই থাকে। সত্য অর্থাৎ পরমাত্মাই কেবল অক্ষয়, অখণ্ড এবং সর্ব ব্যাপক। সেজন্যই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিকে ঈশ্বর তিথি বলা হয়ে থাকে। এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথির দিনের ঋষি যমদাগ্নি এবং তার পত্নী রেনুকার গৃহে ভগবান পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাই এই দিনকে পরশুরাম তিথিও বলা হয়। পরশুরাম সহস্র বাহুর ১০০০টি হাত কেটে, তাঁকে যম লোকে পাঠিয়ে দেন। ভগবান পরশুরাম পৃথিবীকে ২১ বার দুষ্ট রাজাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের সংহার করে। ঋষি যমদাগ্নি পুত্র প্রাপ্তির জন্য, যজ্ঞ করেন, তখন দুইটি প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। পরশুরামের মাতা এবং বিশ্বামিত্রের মাতা দুজনে সখি ছিলেন। তাঁরা সেই প্রাপ্ত প্রসাদ ভাগ করে নিলেন। দৈবিক কারণে প্রসাদের অদল বদল হয়ে যায়, ফলে রেনুকা পুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়দের মতো স্বভাব সম্পন্ন হন। অন্যদিকে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রহ্ম ঋষির পদ প্রাপ্ত করেন। ভগবান শিবের দেওয়া অমোধ ফর্সা পরশুরাম ধারণ করতেন বলে ওঁনার নাম পরশুরাম হয়ে যায়।

পুরাণে চারটি যুগের কথা আমরা পাই। যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি যুগ। তার মধ্যে ত্রেতা যুগের

আরম্ভ এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হয়েছিল, এই কারণে এই তিথিকে যুগের আরম্ভের তিথি, অর্থাৎ যুগাদি তিথিও বলা হয়ে থাকে। এই তিথিতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু, শ্রীহরগ্রীব মাধব রূপে জন্ম নেন, তাই এই তিথিকে নর-নারায়ণ জয়ন্তীও বলা হয়। এই তিথিতে স্বর্গ থেকে মা গঙ্গা, মর্ত্য লোকে অবতরণ করেন মহাদেব শিবের জটার মাধ্যমে। এই কারণে ওই দিন কৈলাস পর্বত, ভগবান শিব, মাতা গঙ্গা এবং ভগীরথের পূজার প্রচলন আছে। বিবাহিত মহিলারা এদিন শিব মন্দিরে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে পূজা করে থাকেন।

জৈন ধর্মাবলম্বীরা এই তিথিকে প্রচন্ড শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করে থাকেন। কারণ জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব ভগবান ১০০ বছরের কঠোর তপস্যার পর ইক্ষুর বা আখের রস পান করে তার উপবাস ভঙ্গ করেন এবং জৈন বৈরাগ্যকে অঙ্গীকার করে সত্য এবং অহিংসার প্রচার করেছিলেন। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ২১ দিন ব্যাপী চন্দন যাত্রা শুরু হয় এবং ভগবানের রথ নির্মাণ করা শুরু হয়। এই চন্দন যাত্রাতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যোগদান করেছিলেন বলে, নবদ্বীপ ধামে সব মন্দিরে অত্যন্ত ভক্তি ভাবনার সঙ্গে অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হয়। সনাতনীদের পবিত্র চারধামের অন্যতম বদ্রীনাথ ধামের কপাট এই পুণ্য তিথির দিনে খোলা হয় এবং দীপাবলির পরে বন্ধ করা হয়। বৃন্দাবন ধামে বৃন্দাবন বিহারীজির শ্রীচরণ কেবলমাত্র বছরে একবারই ভক্তদের দর্শনের জন্য এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই করানো হয়।

কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটিতে ধরিত্রী দেবীর পূজা করা হয়, যার ফলে ধরিত্রী শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে। ওড়িশায় এই দিনটি ধান চাষের শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র রাজস্থান প্রভৃতি প্রদেশে এই দিনটিকে সমৃদ্ধি ও দাতব্যের তিথি বলে মানা হয়। অন্নহীনদের অন্নদান এই দিনের একটি মহৎ কর্ম, দেবতারা এতে খুশি হয়ে বরদান করেন। সুতরাং সনাতনীদের কাছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটিকে শুভ কাজের এবং সমাজসেবা করার দিন হিসেবে পালন করা হয়, যাতে তাঁদের প্রদত্ত কাজ অক্ষয় হয়ে থাকে। সবমিলিয়ে বহু উদ্দেশ্যেই অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হয় হিন্দু সমাজে। ■

পরিষদ বার্তা

রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

গত ২৭/০৩/২০২৬ বিকালে রঘুনাথগঞ্জ জেলার মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ড-এর নিকট রামনবমীর শোভাযাত্রা চলাকালীন মুসলমানরা পরিকল্পনা করে শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ চালায়। তাতে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। এর প্রতিবাদে ব্রহ্মপুর জেলার ডি.এম. অফিসে ৩০/০৩/২০২৬ দুপুর ২: ৩০ মিঃ-এ মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি সুনন্দা ঠাকুর মহাশয়া, তিন বঙ্গের সেবা প্রমুখ কুশল কুণ্ডু মহাশয়, জেলা সম্পাদক সুখদেব বিশ্বাস মহাশয় ও বিধি প্রকোষ্ঠ প্রমুখ সন্তোষ সুত্রধর মহাশয় ডেপুটেশন জমা দেন।

রামনবমীর শোভাযাত্রা, চুঁচুড়া প্রখণ্ড, হুগলী জেলা, মধ্যবঙ্গ

ভারতীয় সংবিধানের শিল্পকার : ড. ভীমরাও আম্বেদকর

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্ম ১৪ই এপ্রিল ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার মৌ নামক স্থানে হয়েছিল। তাঁর পিতা রামজি সকপাল ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে সুবেদার পদে ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল ভীমাবাই। চরম দারিদ্র্যতার কারণে ভীমাবাই ও রামজির ১৪টি সন্তানের মধ্যে তিনজন পুত্র, যথা—বলরাম, আনন্দরাও এবং ভীমরাও তথা তিন কন্যা, যথা—মঞ্জুলা, গঙ্গা এবং তুলসী এই ৬ জন জীবিত ছিলেন। ওঁনাদের জাতি ছিল মাহার, যা তৎকালীন ভারতে অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে মানা হতো। পিতার রামজি সকপাল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, পরিবারকে নিয়ে সাতারা মহারাষ্ট্রে চলে আসেন। তাঁর ঠিক দুই বছর পরে মাতা ভীমাবাই, পরলোক গমন করেন। এরপর তাঁর বাল্যবস্থা পিসি মীরাবাঈ-এর কাছে কাটে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এলফিনস্টোন হাইস্কুল, বোম্বেতে পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি হলেন ভীমরাও। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হাইস্কুল উত্তীর্ণ হন তিনি। সেই সময় সমাজে পিছিয়ে পড়া জাতির মধ্যে শুধুমাত্র ভীমরাও-ই হাইস্কুল পাশ করেছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্স বিষয়ে স্নাতক (বি.এ) পাস করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য আমেরিকা যান তিনি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন তিনি। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ইভলুয়েশন অফ প্রভিন্স ফিনান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এই বিষয়ে পি.এইচ.ডি-তে প্রবেশ করেন। এছাড়া আইন নিয়ে পড়াশোনা এবং অর্থনীতি নিয়ে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এ প্রবেশ করেন। কিন্তু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্কলারশিপের সময়সীমা শেষ হওয়ার জন্য পড়াশোনা এবং গবেষণা মাঝপথে থামিয়ে ভিমরাওজি ফিরে এলেন ভারতে। কিন্তু তাঁর পড়াশোনা করার সংকল্প এতটাই তীব্র ছিল যে, তিনি ৩ বছর ভারতে চাকরি করে কিছু অর্থ উপার্জন করেন এবং বন্ধুদের থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা নিয়ে পুনরায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা প্রবলেমস অফ দা রুপি এই পুস্তকের প্রকাশ হয়। তিনি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ই জুন লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট সম্মানিক উপাধি লাভ করেন।

ভারতের রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বোম্বাই বিধানসভা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং ভীমরাও আম্বেদকরের মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাকে পুনা প্যাক্ট বলা হয়। সেখানে বলা হয়, সমাজের অস্পৃশ্য জাতির সংরক্ষণের কথা। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর গভর্মেন্ট ল কলেজ বোম্বেতে তিনি অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত করেন। এই পদে তিনি দুই বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন ড. আম্বেদকরজি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল ১৫টি আসনে জয় লাভ করে। ১৯৪১-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর মধ্যে থটস অফ পাকিস্তান পুস্তকটিতে ড. আম্বেদকর মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার চিন্তার বিরুদ্ধে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কঠোর সমালোচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লেখেন, 'মুসলিম লীগ এবং জিন্না যখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবে পাকিস্তানের দাবি জানাচ্ছেন, তাহলে সম্পূর্ণ লোক বিনিময় প্রয়োজন।' কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয়নি, এই বলে যে হিন্দু মুসলমানের বিভাজন কাম্য নয়। অথচ এই কংগ্রেস এবং তার নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দুই দেশ তৈরি করলো, যথাক্রমে হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান নামে।

ইংরেজরা খুব তাড়াতাড়ি দেশকে স্বাধীন করে দেবে এই সংবাদ পাওয়ার পরই দেশের সংবিধান রচনা করার পরিকল্পনা আসে নেতৃত্বের সামনে। এই কাজের জন্য

সংবিধান সভা-র গঠন করা হয়। প্রয়াস ছিল এই সংবিধান সভায় সব দল, সম্প্রদায় এবং সব জাতির প্রতিনিধিরা যাতে থাকে। কিংবা যারা এই সংবিধান রচনার জন্য তাদের পরামর্শ দিতে চান, তাঁরা লিখিতভাবে জমা দিতে পারেন। অখিল ভারতীয় অনুসূচিত জাতিসংঘের কার্যসীমিত ডঃ আম্বেদকরকে এই গুরুদায়িত্ব দেয়, যাতে অনুসূচিত জাতি বর্গের হিত বা পক্ষ এই সংবিধান যুক্ত করা হয়। ভীমরাওজি এই কাজ করেন এবং তাঁর প্রস্তাব লিখিতভাবে সংবিধান সভার অধ্যক্ষ ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে দিলেন। যদিও গান্ধীজি ড. আম্বেদকরকে খুব একটা পছন্দ করতেন না, তথাপি সর্দার প্যাটেল প্রয়াস করেন ভীমরাওজিকে সংবিধান সভার সদস্য করার জন্য। তখনকার পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত করে ভীমরাওকে সংবিধান সভার সদস্য করা হয়। কিন্তু বিভাজনের পরে এই বাংলার অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলে, ওঁনার সদস্যতা শেষ হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত ড. এম.আর জয়করের ইস্তফার কারণে বোম্বের একটি সিট ফাঁকা হয়। তখন সেখান থেকে কংগ্রেসের সাহায্যে নির্বাচিত হয়ে আম্বেদকরজি সংবিধান সভায় ফিরে আসেন। সংবিধান সভার ড্রাফট সমিতিতে আম্বেদকরজিকে অধ্যক্ষ বানানো হল। এই প্রসঙ্গে আম্বেদকরজি বলেছিলেন, 'সংবিধান সভাতে অনুসূচিত জাতির হিতের রক্ষায় অতিরিক্ত কোন মহানতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসিনি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমাকে আরো বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই কারণে যখন ড্রাফট কমিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করা হল, তখন খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর যখন এর সভাপতি নির্বাচিত হলাম তখন অত্যন্ত আশ্চর্যচকিত হয়েছিলাম।'

সংবিধানের ড্রাফট সমিতির সদস্য রূপে ওঁনাকে বিপরীত পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়েছিল। এই সভার সদস্য এবং ভীমরাওজির বিশিষ্ট সহযোগী টি.টি কৃষ্ণামাচারী বলেছিলেন, 'সংবিধান সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা জানেন, যে এই ড্রাফট কমিটির সাত জন সদস্য ছিল। কিন্তু ওঁনাদের মধ্যে একজন ত্যাগপত্র দেয় এবং তাঁর স্থানে আরেকজনকে নেওয়া হয়। একজন সদস্যের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর স্থানে অন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়নি। একজন আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন এবং আরেকজন রাজকাজে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে এক বা দুই সদস্য দিল্লি থেকে দূরে নিবাস করেন কিংবা হয়তো অসুস্থ থাকার ফলে সংবিধান সভার বৈঠকে আসতে পারেননি। ফলে এই ড্রাফট সমিতির সমস্ত দায়িত্ব আম্বেদকরজিকে নিতে হয়েছিল।' খুব একটা সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপকে অগ্রাহ্য করেই আম্বেদকরজি সংবিধান তৈরি করার কাজ করে চলেছিলেন। শুধু তাই না প্রায় ১০০ দিন সংবিধান সভায় দাঁড়িয়ে থেকে সম্পূর্ণ সংবিধানের ড্রাফট ধৈর্য্যপূর্বক সবাইকে বুঝিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম আইন মন্ত্রীর পদপ্রাপ্ত করেন শ্রীআম্বেদকর। বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ও স্বীকৃতি নিয়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সর্বস্তরের মানুষদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন ড. ভীমরাও আম্বেদকর, যাকে ভারতের সংবিধান হিসেবে সারা দেশে ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক কে.টি শাহ সংবিধানের প্রস্তাবনায়, ধর্মনিরপেক্ষ, ফেডারেল, সামাজতান্ত্রিক শব্দগুলো রাখার দাবি জানিয়েছিলেন। তখন ভীমরাওজি বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত, সমাজকে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কিভাবে সংঘটিত করা উচিত, সে বিষয়ে সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে জনগণকে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এটাও যদি সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা জনগণের স্বাধীনতার হরণ করা হবে।' কিন্তু ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস জরুরি অবস্থার আড়ালে এই ঘৃণ্য কাজটাই করেছিলেন। আম্বেদকরজির বিচারধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা আর.বি.আই তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সেই বছরই ৬ ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গোলকধামবাসী হন।

এই মহাপুরুষের অবদানকে অস্বীকার করার জন্য ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত সংসদের সেন্ট্রাল হলে আম্বেদকর প্রতিকৃতি স্থাপনের বিষয়টি অস্বীকার করা হয় এবং ভারতের সংবিধান প্রণয়নকারীকে কংগ্রেস আমলে ভারতরত্ন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কিন্তু ড. আম্বেদকরের মৃত্যুর ৩৪ বছর পর, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন-এর দ্বারা, ওঁনার স্ত্রী সবিতা আম্বেদকরের হাতে ভীমরাওজির প্রাপ্ত ভারতরত্ন সম্মান পত্রটি সমর্পণ করেন। মনে রাখা দরকার, ওঁনাকে এই সম্মান প্রদান কিন্তু করা হয়, অকংগ্রেসী সরকার দ্বারা। ■

বিকৃত ইতিহাস লিখন ভারতীয়দের প্রতি ষড়যন্ত্র

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

ভারতবর্ষ বিশ্বের প্রাচীনতম রাষ্ট্র। সনাতনীদের চিরঞ্জীবী সংস্কৃতি এবং তত্ব জ্ঞানের জন্য একটি সমৃদ্ধ সম্পন্ন রাষ্ট্র, যাকে বিদেশীরা 'সোনেকি চিড়িয়া' বলতো। ভারতীয়দের জীবনের সমগ্র ভাবধারাতে ত্যাগের ভাবনা, সহিষ্ণুতা, নারীদের প্রতি আদর ভাবনা, বিবিধের মধ্যে ঐক্যের ভাবনা, সম্পূর্ণ মানব জাতি চরাচর সৃষ্টির ভাবনা প্রভৃতির জন্য বিশ্বের নজরে বিশেষ আসন পেয়েছিল। প্রকৃতির প্রতি সনাতনীদের মনে শোষণ নয়, দোহন এবং কৃতজ্ঞতার ভাবনা আছে। এইসব গুণের জন্য বিদেশীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল ভারত। তাই সময়ে সময়ে ভারতবর্ষকে নানান আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং বেশিরভাগ যুদ্ধেই ভারতীয়রা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু ইউরোপিয়ান এবং মুসলমানরা ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়াস করেছিল। স্বাধীনতার পর এই কাজে কংগ্রেস এবং বামপন্থী ইতিহাসবিদরা যোগদান করেন এবং ভারতের গৌরবশালী সংঘর্ষের ইতিহাসকে পরাজয়ের ইতিহাস বানিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল।

জানা দরকার, স্বাধীন ভারতের প্রথম পাঁচজন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান ছিল। তারা ইচ্ছে করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভারতীয়দের গৌরবপূর্ণ অধ্যায় যথা—যবন (গ্রীক, ইউনানী), শক, হুণদের আক্রমণ এবং তাদের পরাজয়ের ইতিহাস খুব একটা না পড়ানো, রাজা বিক্রমাদিত্যের বর্তমান আরব দেশ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারকে এড়িয়ে যাওয়া, ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের বর্তমান থানে নামক স্থানে ইসলামী আক্রমণ এবং পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সিন্ধু প্রান্তের সাগরে তটে ইসলামী আক্রমণ এবং পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়া, ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ছয় বার আক্রমণকে হিন্দু রাজাদের দ্বারা প্রতিহত করার ইতিহাস, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে বালুচিস্তান জেতার সফলতা, ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশের মরু দস্যুরা ভারতে আক্রমণ করে এবং জেহাদের ডাক দেয় কিন্তু ভারতীয়রা এমন জবাব দেয় যে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, ৬৩৬ থেকে ৭১১ এই ৭৫ বছরে ১৩-১৪টি আক্রমণ করে ইসলামী আক্রান্তরা, কিন্তু পরাজিত হয়। এইসব ইতিহাস সাধারণভাবে পড়ানোই হয় না। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরাই কেবলমাত্র এই সত্য তথ্য খুঁজে পান।

কিন্তু ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসেম ভারত আক্রমণ করে জয়লাভ করে, তা অত্যন্ত বিস্তার পূর্বক পড়ানো হয়। যদিও ৭১৪-৭১৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুরা পুনরায় সিন্ধু প্রান্ত জিতে নিয়েছিল। মোহাম্মদ গজনী প্রথমবার সোমনাথ আক্রমণ করে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপর ১৭ বার আক্রমণ করে, সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। এটি পড়ানো হয়, কিন্তু সোমনাথ মন্দির বাঁচানোর জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার বীর সনাতনীরা বলিদান দিয়েছিল তা পড়ানো হয় না। বারংবার আক্রমণ করার পরেও সনাতনী শক্তির প্রতীক তাঁরা মেটাতে পারেনি। একজন হিন্দি কবি বলেছিলেন, 'কিতনে গজনী, খিলজী, ঔরঙ্গজেব আয়ে, আউর চলে গয়ে, পর ভোলেবাবাকে আগে সারে পাপি রাখ (ভস্ম) হুঁয়ে।' বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ১০০০ বছর পর 'সোমনাথ স্বাভীমান পর্ব' পালন করে সনাতনী পতাকাকে তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের তৎকালীন গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এই সোমনাথ মন্দিরের জীর্নোদ্ধার করান এবং সেই সময়কার রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করেন। কিন্তু তখনকার প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার ছবি খারাপ হবে। অথচ এই নেহরু দেশের বিভাজনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদগুলো নির্মাণের জন্য অর্থ দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। নরেন্দ্র মোদি এই অনুষ্ঠানে সোমনাথ মন্দির পুনঃনির্মাণের ৭৫তম বছরে লৌহপুরুষ সর্দার প্যাটেল এবং ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে স্মরণ করেন।

পুরাতন ইতিহাসবিদরা মহম্মদ ঘোরি ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের যুদ্ধে ১৬ বার পরাজয়ের ইতিহাসকে গৌণ করে ১৭তম বারে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের ইতিহাসকে বেশি মান্যতা দেন। বাবর ও মহারানা রানাসাঙ্গার যুদ্ধ,

মহারানা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ, মারাঠী বীর ছত্রশাল, বাজীরাও পেশওয়া, শিখ গুরুদের এবং মহারাজা রঞ্জিত সিংহ প্রমুখ তেজশ্রী যোদ্ধার ইতিহাসকে গুরুত্ব না দিয়ে, মোঘলদের মহিমা মন্ডনের কাজই করেছিলেন তাঁরা। প্রকৃত ইতিহাসকে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারব, যে সনাতনী হিন্দুদের ইতিহাস সংঘর্ষ, পরাক্রম, বীরত্বের এবং প্রেরণাদায়ক। বাস্তবে আমাদের ইতিহাসে পরাজয় দর্শানো একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এতবার জিহাদী আক্রমণ, অত্যাচার হওয়ার পরেও ভারতবর্ষে পূর্ণরূপে ইসলামীকরণ হয়নি। তার কারণ একদিকে যেমন আমাদের পরাক্রমী যোদ্ধাদের বলিদান ছিল, ঠিক অন্যদিকে আমাদের সমাজে ভক্তির পরম্পরার জন্য তা সম্ভব হয়নি। ১৩তম শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া ভক্তি পরম্পরার কারণে সর্বসাধারণ জনতার মধ্যে ধর্মের জাগরণ হয় এবং ধর্মনিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। ধর্মান্তরণ জেহাদে খানিকটা হলেও লাগাম লাগে। কিন্তু আজও খ্রিস্টান মিশনারীরা নিঃশব্দে সেবার আড়ালে এই কাজ করে যাচ্ছে, যাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদেরও সেবা কাজকে বাড়িয়ে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দরকার। সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে, 'যদি কেউ এস.সি, এস.টি-র মানুষ ধর্মান্তরণ করেন তাহলে তাকে বা তাদের এস.সি, এস.টি-র কোন সুবিধা দেওয়া হবে না। কারণ খ্রিস্টধর্মে এই ধরনের জাতির কোন ব্যবস্থা নেই'। এই রায়ের পর সম্ভবত ধর্ম পরিবর্তন করানোর হার কমবে, যা একটি শুভ সংবাদ।

মুসলিমরা লাভ জিহাদ, হালাল জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ প্রভৃতি নানা কৌশল অবলম্বন করছে। এর প্রতিকার করার জন্য সজাগ থেকে, প্রশাসনের মদত নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বাস্তবে আমরা ইসলামের অধ্যায়ন করিনি এবং কৃষ্ণনীতি ও চাণক্যনীতি পালন করিনি। মুসলমান আক্রমণের আগে, গুণকর্মের আঁধারে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, তবে সমাজে অস্পৃশ্যতা খুব একটা ছিল না। কিন্তু মুসলিম আক্রমণের পর হিন্দু সমাজে অসমতা ও অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি হয়। যদিও ব্যবহার সমানতা আমরা কুম্ভস্নান, জ্যোতির লিঙ্গের দর্শন, ৫১ শক্তি পিঠের দর্শন প্রভৃতি ধার্মিক কাজে আজও পাই। বাস্তবে হিন্দুরা কোন না কোন ঋষির সন্তান, তাই সকলের গোত্রের মধ্যে সমানতা থাকে। কিন্তু আক্রমণের কারণে অনেক জাতির নির্মাণ হয়, অস্পৃশ্যতা বাড়ে, ধর্মান্তকরণ থেকে বাঁচার জন্য অনেক মানুষ গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পলায়ন করে। ইংরেজরা চতুর ছিল, তাই তারা এই জাতিভেদের সংঘর্ষ এবং বিদ্বেষকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বিভাজন করা এবং শাসন করার নীতিকে ইন্ধন জুগিয়েছিল, এইসবের ফলে হিন্দু সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এর প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের হিন্দু ধার্মিক আস্থাগুলোর দৃষ্টিকরণ করতে হবে। ভোগবাদের দুষ্পরিণামকে অবগত করাতে হবে। হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করে, ভুক্তভোগীদের আবার ফিরিয়ে এনে সমাজের মধ্যে স্বীকৃতি দেওয়াতে হবে। সমাজে এই বিষয়ে বারবার জাগরণ এবং প্রবোধনের কার্যক্রম করাতে হবে। পরিবার, সমাজ এবং দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। এইসব কাজের জন্য একদিকে প্রকৃত ইতিহাসের পুনঃ লিখন করাতে হবে এবং সমাজে একতার ভাবকে জাগ্রত করতে হবে। 'ন হিন্দু পতিতো ভবঃ' এই উদঘোষকে সার্থক করে তুলতে হবে। তাই বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনকে এই কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

অতীতের ইতিহাসকে ভুললে চলবে না, ভুলতে গেলে আবার সনাতনকে ভাঙবার জন্য ষড়যন্ত্র হবে। অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সজাগ হতে হবে। প্রত্যেক অপমান এবং ষড়যন্ত্রের প্রতিকার করার জন্য সংস্কার এবং দেশ ভক্তিকে জাগ্রত করাতে হবে। তবেই আমরা বলতে পারব, 'কত গাজী এসেছে, কত গাজী কবর হয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্থান আজও মহান আছে আর কালও মহান থাকবে।' ■

মেদিনীপুর শহরে হিন্দু সম্মেলন, দক্ষিণবঙ্গ

ভারতবর্ষকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস নেতৃত্ব

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

পারস্যের সম্রাট আলেকজান্ডার পুরু রাজার সঙ্গে যুদ্ধের পর স্বদেশে ফিরে যান এবং তার সেনাপতি সেলুকাসকে জয় করা রাজত্বের শাসনভার তুলে দেন। সেলুকাস পরে মগধের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন এবং তার মেয়ে হেলেনার বিবাহ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে করিয়ে দেন। তখন আচার্য চাণক্য বলেছিলেন যে, 'বিদেশি রানীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান কিংবা তার মাতাকে কখনোই স্বদেশের অর্থাৎ ভারতের শাসনভার দেওয়া উচিত না, কারণ তার জন্মগত শিকড়ে বিদেশের প্রতি টান অবশ্যই থাকে। গত ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের, ২৫শে মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবধারা প্রভাবিত ইংরেজি পত্রিকা অরগানাইজারের অনলাইন ভার্সনে, 'সোনিয়া গান্ধীর মিশন বিশ্বাসঘাতকতা' নামক শীর্ষকে বলা হয়েছে, কেজিবি সম্পর্ক থেকে জর্জ সোরোসের যোগসাজশ, জেনে নিন কিভাবে তিনি পরিকল্পিতভাবে ভারতবর্ষকে দুর্বল করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'সোনিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী মিশন পরিচালনা করেছেন, যা ভারতকে ভিতর থেকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে তুলেছে। রাশিয়ার কেজিবির সঙ্গে কথিত সংযোগ থেকে শুরু করে ডিপ স্টেটের বিশ্বায়নবাদী সোরেসের মদতে দেশের সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টার চিত্র তুলে ধরেছে। সেখানে বলা হয়েছে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে অটল বিহারী বাজপেয়ী পরিচালিত সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে সোনিয়া গান্ধী অলিখিতভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের ইতিহাসে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। পরিকল্পিতভাবে হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য করে ধর্মান্তরণে উৎসাহ প্রদান, জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্ন এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ সহজতর করা হয়। একটি আপসহীন মিডিয়া ইকোসিস্টেম এবং গভীরভাবে প্রোথিত আমলাতান্ত্রিক নেটওয়ার্কের সহায়তায় সোনিয়াজি প্রতারণা, বিভাজন এবং ধ্বংসের এক উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

প্রতিবেদনে পূর্বতন সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, স্নায়ু যুদ্ধের যুগের সোভিয়েত গোয়েন্দার নথি থেকে জানা গেছে যে, কেজিবির কংগ্রেস দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল, যার মধ্যে সোনিয়া গান্ধীও ছিলেন। আরও জানা যায়, কেজিবি অফশোর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কংগ্রেস অর্থ পাচার করত। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে, এই সম্পর্ক সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। কিন্তু ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সোনিয়ার উত্থানের পর এই ধরনের বিদেশী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পুনরায় তৈরি হয়। বলা হয়েছে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সোনিয়ার চাপে ইউ.পি.এ সরকার ৯৩তম সংবিধান সংশোধনী আনে, যার ফলে হিন্দু পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং সংখ্যালঘুদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করে। এটি ছিল দলিত এবং উপজাতিদের হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি কৌশলগত প্রচেষ্টা। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার অধিকার আইন হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোতে ২৫% সংরক্ষণ দুর্বল শ্রেণীর জন্য বাধ্যতা-মূলক করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করান তিনি। অথচ সংখ্যালঘু পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অক্ষত রাখা হয়। আবার ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলোর প্রার্থনা থেকে 'অসতো মা সদগময়া' বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়, যাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মুছে ফেলা যায়। ইউ.পি.এ শাসনকালে সোনিয়াজি দূরদর্শনের লোগো থেকে 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-কে বাদ দিয়ে দেন, যা ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি নীতিমালা মুছে ফেলার একটি প্রচেষ্টা। ভিতর থেকে হিন্দু ধর্মকে ভেঙে ফেলা ষড়যন্ত্রের কারণে কংগ্রেস যখন স্বাধীনতার পরে যেমন শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদের হিন্দু ধর্ম থেকে পৃথক করেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই সোনিয়া গান্ধী শিক্ষাগত বিধি নিষেধ তৈরি করেছিলেন। ফলে কর্ণাটকের লিঙায়ত সম্প্রদায় ও সাইভক্ত সম্প্রদায়ের মতো অনেক হিন্দু গোষ্ঠী পৃথক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করতে শুরু করে।

হিন্দু বিশ্বাস ও আস্থার উপর আঘাত হানার জন্য ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার সুপ্রিমকোর্টে একটি হলফনামা দাখিল করে, ঘোষণা করে

যে—ভগবান রাম, মাতা সীতা এবং ভগবান হনুমান কাল্পনিক চরিত্র, তাই রাম সেতুর কোন ধার্মিক তাৎপর্য নেই। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলোর দেশব্যাপী আন্দোলনের পর তৎকালীন সরকার সেই বিবৃতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের আগে বিশ্ব কখনো হিন্দু সন্ত্রাসবাদ শব্দটি শোনেনি, কিন্তু মালেগাঁও এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের পর সোনিয়ার সরকার হিন্দু গোষ্ঠীগুলোকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে তকমা দেওয়ার প্রয়াস করে। আর.টি.আই অনুসন্ধানে জানা গেছে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারগুলো বিশেষ করে কর্ণাটক রাজ্যে গির্জাগুলোতে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, অথচ হিন্দু মন্দিরগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণের অধীন ছিল। এই তীব্র বৈষম্য ধর্মান্তরণকে উসকে দিয়েছে এবং বিদেশি অর্থায়নে ধর্ম প্রচারকদের নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে প্রসারিত করতে সক্ষম করেছে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কাঞ্চি শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতীকে দীপাবলির রাতে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারণ শংকরাচার্য খ্রিস্টান মিশনারী ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা ছিলেন। এটিও সোনিয়া গান্ধী সরকার দ্বারা পরিকল্পিত ছিল।

দেশের সেনাবাহিনীতে বিভেদের বীজ বপন করার জন্য সোনিয়া গান্ধীর আমলে সাচ্চার কমিটির সুপারিশে সেনাবাহিনীতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের একটি জরিপ করার কথা বলা হয়েছিল। বাস্তবে যা ছিল সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভাজনের একটি প্রয়াস। কিন্তু জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর কঠোর প্রতিক্রিয়ার ফলে সরকারকে পরিকল্পনাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল। এই প্রতিবেদনের দাবি করা হয়েছে জর্জ সোরেস এবং তার ফোরাম অফ ডেমোক্র্যাটিক লিডারস ইন এশিয়া পেসিফিকের সঙ্গে সোনিয়াজির গভীর সম্পর্ক আছে। নথিপত্র সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জর্জ সোরেসের সংযোগের কথা প্রকাশ পেয়েছে। সোরেসের ওই সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সলিল শেঠি, রাহুল গান্ধীর ভারতজোড়ো যাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণে ছিল। এছাড়াও মোদি বিরোধী প্রচার পরিচালনকারী অর্গানাইজেশন ক্রাইম এন্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (OCCRP) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে তহবিল পায় তারা। বাস্তবে সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং ডিপ স্টটের এজেন্ডার মধ্যে একটি যোগসূত্র পাওয়া যায়, তা কিন্তু কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি ভারতবর্ষকে অস্তিতিশীল করার একটি বৃহত্তর সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার অংশ মাত্র।

বর্তমান সময়েও কংগ্রেস পার্টি এবং তার দলের নেতরা ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ে এমন সব অবান্তর প্রশ্ন তুলেছেন, যাতে বিশ্ব দরবারে ভারতের সম্মানহানি হয়। একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ চলেছে, আরেকদিকে ইরান, ইজরাইল-আমেরিকার যুদ্ধ, অন্যদিকে আরব দেশগুলোর উপর ইরানের আক্রমণ চলছে। এই আবহাওয়াতে ভারতবর্ষ তার কুশল নীতির প্রয়োগে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং দেশের সুরক্ষা ও উর্জা নীতিকে বলিষ্ঠভাবে স্থাপিত করেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত একজোট হয়ে বৈশ্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেমন চলা উচিত, সেই ভাবেই চালানো, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম এই নীতিকেই সবার অনুসরণ করা দরকার, যা সোনিয়াজির পুত্র ও কন্যার বোঝা উচিত। ■

মেডিক্যাল চেকআপ ক্যাম্প, গোপালী আশ্রম, খড়্গপুর, দক্ষিণবঙ্গ

রামনবমীর শোভাযাত্রা, বলরামপুর, পুরুলিয়া জেলা, মধ্যবঙ্গ

ভারতীয় নারী : পরিবর্তনের এবং রাষ্ট্র নির্মাণের অগ্রদূত

পারমিতা পাল

যেকোন সমাজের বাস্তবিক প্রগতির মানদণ্ড সেই সমাজে নারীদের স্থিতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে রাষ্ট্র নারীদের শিক্ষা, সম্মান, স্বতন্ত্রতা প্রদান করেছে, সেই রাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে সশক্ত এবং সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে শক্তির দেবী দুর্গা, ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী এবং বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা বা পূজা করা হয়। ভারতবর্ষে পূজা পার্বণগুলোর মাধ্যমে, সারা বছর ধরে কোন না কোন নারী শক্তির আরাধনা চলতেই থাকে। এমনকি মাতৃভূমিও আমাদের কল্পনায় এক নারীর রূপ, যাকে আমরা ভারত মাতা বলি। যে দেশে দেশমাতৃকার জয়ধ্বনি দিয়ে 'ভারত মাতা কি জয়' আওয়াজ ওঠে, সেই দেশে বছরের কোন একটি বিশেষ দিনকে নারী দিবস বলার কোন তাৎপর্য থাকে কি? আমরা বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে নারীকে সম্মান জানিয়ে থাকি এবং তাকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে মা, মাসি, কাকি, জেঠি, দিদিমা, ঠাকুমা, বোন, দিদি, বৌদি গৃহকর্ত্রী রূপে বসিয়ে রাখি আজীবন।

প্রাচীন ভারতের নারীদের পুরুষদের সমান মর্যাদা দেয়া হতো। লিঙ্গের ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা হতো না। ঋষি-মুনিদের স্ত্রী-রা তাদের স্বামীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে অংশ নিতেন। প্রাচীন পুঁথি-পত্রে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যজমানকে স্ব-স্ত্রীক বসার উল্লেখ আমরা রামায়ণ-মহাভারতে দেখেছি, এমনকি বর্তমানকালেও এই বিধান প্রচলিত আছে। এই তথ্যকে বোঝানোর জন্য তৈত্তিরিও সংহিতায় নারী এবং পুরুষকে একটি গাড়ির দুই চাকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সমাজে উভয়ই সমমর্যাদা সম্পন্ন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এ গার্গী এবং মৈত্রেয়ী-র মতো নারীরা দার্শনিক বিতর্কে অংশ নিতেন বলে উল্লেখ আছে। যা প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতে জ্ঞানচর্চায় নারীদের মর্যাদা ছিল উচ্চস্থানে। ঋকবেদে নারীদের জ্ঞানচর্চা এবং শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত ছিল বলে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতে নারীকে গৃহের লক্ষ্মী বলে উল্লেখ করেছে। মনুস্মৃতিকে প্রাচীন ভারতের হিন্দুধর্মের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী আইনশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র বলা হয়। সেখানে আছে—

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে। রমন্তে তত্র দেবতা।।'

অর্থাৎ যে স্থানে নারীর সম্মান করা হয়, সেখানে দেবতারা আনন্দে বাস করেন। এই শ্লোক দ্বারা সমাজে নারীর মর্যাদা রক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। বৈদিক কাল থেকে মধ্যযুগীয় ভারতে অনেক বিদুষী নারীরা নিজেদের জ্ঞান, সাধনা এবং রচনাত্মক কার্যকলাপ দ্বারা সমাজকে দিশা প্রদান করেছিলেন। এছাড়া শিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য এবং সমাজ সুধারকের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উপনিষদকালীন ব্রহ্মবাদিনীরা আজও হিন্দু সমাজে বিদ্বানদের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হন। সেইরূপ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নারীরা হলেন—

১) গার্গী (জ্ঞানের প্রতীক) : ঋষি গর্গের বংশে ঋষি বচন্যুর কন্যা ছিলেন গার্গী। মহান প্রাকৃতিক, দার্শনিক, বেদের বক্তা এবং ব্রহ্ম বিদ্যার জ্ঞানী বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বৃহদারণ্য উপনিষদে রাজা জনকের রাজসভায় যাজ্ঞ্যবল্ক মুনির সঙ্গে আধ্যাত্মের ওপর সংবাদ (কথোপকথন) এর বিবরণ পাওয়া যায়।

২) মৈত্রেয়ী : আত্মজ্ঞানের খোঁজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, এই মহান বিদুষিনী। ইনি যাজ্ঞ্যবল্ক মুনির সহধর্মিনী (স্ত্রী) ছিলেন। তিনি ভৌতিক সম্পদের স্থানে আত্মজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেশি বলেছিলেন— 'সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধন দ্বারা ভরে দিলেও অমরত্ব পাওয়া যাবে কি?' ওঁনার এই বচন জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ, যা জ্ঞানকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৩) লোপামুদ্রা : মহান ঋষি অগস্ত্যর স্বনির্মিত (নিজ সৃষ্টি) নারী মূর্তি ছিলেন লোপামুদ্রা। ওঁনাকে বরপ্রদা এবং কোশীতোকি-ও বলা হতো। লোপামুদ্রা ঋকবেদের অষ্টম মন্ডলের ১৭৯তম সুপ্ত রচনা করেছিলেন। তার জীবন দর্শন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার সমর্থন দেখাতে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের মহিলারা কেবলমাত্র গৃহিণীই ছিলেন না, বরং বেদার্থ এবং আধ্যাত্মিকতার সাধিকাও ছিলেন।

৪) **বিশ্ববারা :** অত্রী মুনির বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ববারা ব্রহ্মা-বাদিনী। তিনি বেদের অনুসাধন-কারী বিদূষিনী ছিলেন। ঋকবেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮তম সুক্তের রচনা করেছিলেন তিনি।

৫) **ঘোষা :** ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কাক্ষীবান ঋষির কন্যা ছিলেন। ওঁনাকে মন্ত্রদ্রিকাও বলা হতো। ওঁনার একবার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। তাই এই রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি নিজে বেদ এবং আয়ুর্বেদের গহণ অধ্যায়ন করে নিজে বিদূষী ও ব্রহ্মবাদিনী হন। ওঁনার চিকিৎসা দেবতাদের বৈদ্য অশ্বিনী কুমার ভাইরা করেন এবং ওঁনাকে বিশ্বসুন্দরী বানিয়ে দেন। ঘোষা নিজের জীবনকে পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতার পথে নিয়োজিত করে দেন।

৬) **দেবমাতা অদিতি :** দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং মহাঋষি কশ্যপের পত্নী ছিলেন অদিতি। চার বেদের জ্ঞাতা ছিলেন তিনি। তাই তিনি নিজের পুত্র ইন্দ্রকে বেদ এবং শাস্ত্রের শিক্ষা দেন। এই জ্ঞানের জন্যই ইন্দ্রদেব লোকের অধিপতি হয়েছিলেন। মাতার নামে ইন্দ্রের নাম আদিত্যেয় হয়। সেইজন্য মাতা অদিতিকে অজর-অমর বলে মানা হয়।

৭) **অপালা :** মহান ঋষি অত্রির একমাত্র কন্যা ছিলেন অপালা। তিনি একবারেই বেদের মন্ত্রগুলো শুনে মুখস্ত করে নিয়ে চার বেদের জ্ঞাতারূপে মান্যতা প্রাপ্ত করেন। চর্ম রোগে পীড়িত হওয়ার জন্য, ওঁনার স্বামী ওঁনাকে ত্যাগ করেন, তাই তিনি বাবার বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর ফিরে এসে তিনি আয়ুর্বেদের গভীর অনুসন্ধান করে 'সোমরস'-এর আবিষ্কার করেন। ইন্দ্রদেব এই সোমরসের বিনিময়ে অশ্বিনীকুমারদের দ্বারা অপালার চিকিৎসা করেন। চিকিৎসার পরে বিশ্বসুন্দরী হয়ে যান। তারপর তিনি ঋকবেদের মধ্যে অষ্টম মণ্ডলে ৯১তম সূত্র থেকে ১০৭ পর্যন্ত ঋতকাগুলো সংকলিত করেন এবং গহণ অধ্যয়ন করেন।

৮) **শচী :** দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের পত্নী ছিলেন শচী দেবী। ইনি বেদের খুব বড় বিদ্বান ছিলেন। ঋকবেদের অনেক সূত্রের উপর অনুসন্ধান করেন তিনি। তিনি মহান নীতিবান ছিলেন এবং নিজের জ্ঞান দ্বারা স্বামীর হারানো সাম্রাজ্য ও পদ প্রতিষ্ঠাকে পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

৯) **বিদূষী অরুন্ধুতী :** ঋষি বশিষ্ঠের পত্নী এবং বেদের প্রচন্ডজ্ঞাতা ছিলেন অরুন্ধতী। নিজের জ্ঞান দ্বারা সপ্তঋষি মণ্ডলে ঋষিপত্নী রূপে গৌরবশালী স্থান প্রাপ্ত করেছিলেন তিনি।

১০) **ভাভতী :** আদি শঙ্করাচার্যের শিষ্য বাচস্পতি মিশ্রমন্ডলের স্ত্রী ছিলেন তিনি। ভাভতী টীকার (ভাভতী সম্প্রদায়) মধ্যে ভারতীয় অদৈত্ব বেদান্তের উপর ওঁনার গ্রহণ অধ্যয়ন-এর প্রমাণ দেয়। ওঁনার জ্ঞান ভারতীয় তত্ত্ব জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিদ্বান এবং বিদূষী নারীদের বৃত্তান্ত আমাদের সামনে খুব একটা তুলে ধরা হয় না। উপরন্তু নানা ধরনের অসঙ্গত খুব কুৎসা-রটোনার চেষ্টা করা হয় সনাতন বিরোধীদের দ্বারা। যেমন—সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল বলে প্রচার করা। কিন্তু আমরা রামায়ণে দেখেছি, রাজা দশরথ মারা যাবার পর কিন্তু তার রানীরা (কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা) কেউই সতী হননি। মহাভারতের কৌরবদের স্ত্রী, কর্ণের স্ত্রী, অভিমন্যুর স্ত্রী কিংবা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সতী হওয়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সতী প্রথা ছিল না, কিন্তু বিধর্মীদের আক্রমণের পরে মেয়েদের অস্মিতা রক্ষার জন্য সতী প্রথা বেছে নিয়েছিল তখনকার নারীরা। রাজপুত রমণীরা সাময়িকভাবে জহর প্রথা প্রচলনের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করতেন। মূলত মৃত্যুর পরেও তাদের দেহকে ব্যভিচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। পরবর্তী সময়ও নারী শাসকেরা, যেমন—রানী লক্ষ্মীবাঈ, রানী দুর্গাবতী, রানী অহল্যাবাঈ হোলকর প্রমুখ সকলেই দেশ শাসন ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১৭৩ বছর আগে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার এক সাধারণ গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন 'মা সারদামণি'। তিনি নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার, আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার কথা বলে গিয়েছিলেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বালিকা সারদা সমাজের কুসংস্কার অগ্রাহ্য করে লুকিয়ে বর্ণপরিচয় শেখার চেষ্টা করেন। তার পড়াশোনা করার স্পৃহা এতটাই ছিল যে, ঠাকুর যখন অসুস্থ হয়ে কিছুদিনের জন্য শ্যামপুকুরে চিকিৎসা করাতে যান, তখন তিনি আবার পড়া শেখার চেষ্টা করেন। কারণ মা সারদা জানতেন শুধু ত্যাগ আর কর্তব্য করলে নারী এবং সমাজের কোন উন্নতি হবে না। সঙ্গে থাকতে হবে জ্ঞানের আলো, যা ভালো মন্দের পার্থক্য করবে। কুসংস্কার ভেঙে প্রকৃত সংস্কারে মেয়েরা মাথা উঁচু করে সমাজে চলাফেরা করতে পারবে। নারীর শিক্ষা বা সমানতার ক্ষেত্রে অতুলনীয় কাজ করে গেছেন এমন

অনেক মানুষের কথা আমরা জানি। কিন্তু মা সারদার কাজটা ছিল নীরবে। তিনি বলতেন, 'লেখাপড়া শিখলে, কাজকর্ম শিখলে নিজেরাও সুখে থাকবে, অপরকেও সুখে রাখতে পারবে, তাদের নানাভাবে উপকার করে।' সেই সময় তিনি গোঁড়া সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতাকে কন্যাসম আদর করতেন। এছাড়া 'সারাবুল' এবং 'জোসেফিন ম্যাক লাউড' ভারতে এসে ভারতীয় নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার পরিচয় পান। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারে স্থাপিত স্কুলে মেয়েদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শেখানো হতো। মা সারদা নারী শিক্ষার অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন, তাই বাল্যবিবাহে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। তিনি প্রথাগত শিক্ষা বাদেও স্বনির্ভর শিক্ষার পক্ষে ছিলেন।

ভারতবর্ষে নারীদের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দেমাতরম গানে মাতৃভূমির বন্দনার মাধ্যমে নারীকে মমতাময়ী মা, শক্তির দেবী এবং সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এই গানটি কেবলমাত্র দেশ প্রেমের গান নয়, সঙ্গে সঙ্গে নারী শক্তির ও মাতৃত্বের মহিমার এক কাব্যিক প্রকাশ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান ভারতের এক কবির লেখা পঙ্‌ক্তি—

'অবলা জীবন হায় তোমার এই কাহিনী।
আঁচলে দুধ আছে আর চোখে পানি।।'

যদিও বর্তমানে এই পরিস্থিতি থেকে নারী অনেক এগিয়ে গেছে। আজকের নারী কেবলমাত্র পরম্পরা সংরক্ষণই নয়, বরং পরিবর্তনের ধারক-বাহক এবং রাষ্ট্র নির্মাণের অগ্রদূত হয়ে গেছে। বর্তমান ভারতে নারী সশক্ত, আত্মনির্ভর, শিক্ষিত ও জাগরুকতা সম্পন্ন। নিজের পরিচয় নিজে গড়ে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয় সহভাগিতা নিচ্ছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে ৯০ লক্ষের বেশি স্বয়ং সহায়তা ব্যবসা কেন্দ্রের পরিচালনার মাধ্যমে কোটি কোটি মহিলা স্ব-রোজগারের দিশায় অগ্রসর হয়েছে। এর ফলে নারী আর্থিক রূপে সক্ষম হয়েছে এবং পরিবারে তথা সমাজে সম্মানও পেয়েছে। ফলে সমাজ ও পরিবারে তাদের স্থান দৃঢ় হয়েছে। নারীদের অংশীদারী এখন—সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, প্রশাসন, নগর পালিকা, কর্পোরেট জগতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, খেলাধূলা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। সরকার ও তাদের যোজনার মধ্যে মহিলাদের স্বাস্থ্য পোষণ, কৌশল বিকাশ এবং আর্থিক সমাবেশনকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস করে চলেছে। আজ নারী শক্তিকে দেশের রাষ্ট্রপতির পদে, অর্থমন্ত্রীর পদে, সেনানায়কের পদে আমরা দেখেছি, যা বাস্তবে নারীর স্বশক্তি উৎঘোষক। ভারতীয় নারীর স্বশক্তকরণের এবং শিক্ষার জন্য 'সাবিত্রী বাঈ ফুলে' বলেছিলেন, 'যখন নারী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আগে এগোবে, তখনই সমস্ত রাষ্ট্র প্রগতির পথে অগ্রসর হয়।

ক্রিকেট জগতে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দু-দুটো বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতের মেয়েরা। ভারতীয় মহিলা একদিবসীয় বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হারমানপ্রীত কৌর, সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধনা ইতিহাস রচনা করেছেন এবং মহিলা টি-টোয়েন্টি অন্ধ বিশ্বকাপ খেলাতে জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন দীপিকা টিসি ইতিহাস রচনা করেছেন। এছাড়া দিব্য দেশমুখ সতরঞ্জ অর্থাৎ দাবা খেলায় মহিলা বিশ্বকাপ জয় করেছেন। সুরুচি ইন্দর সিংহ ১০ মিটার এয়ার পিস্তল খেলাতে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছেন। এই বছরে পাঁচটি আন্তর্জাতিক কাপে ভারতের মেয়েরা গৌরব অর্জন করেছেন। হাতবিহীন প্যারা অলিম্পিকে শীতল দেবী প্রথম ভারতীয় তীরন্দাজ হয়ে চর্চার বিষয় হয়েছেন। এছাড়া শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ, তিতাস সাধু ক্রিকেট খেলায় তাঁদের প্রতিভাকে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে নৈহাটির সুতীর্থ এবং অয়হীকা মুখার্জি আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসে পদক জয় করেছেন। পদ্মশ্রী মৌমা দাস টেবিল টেনিসে তার প্রতিভাকে জগত সভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সৃজনী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ISC পরীক্ষাতে ৪০০/৪০০ পেয়ে সম্পূর্ণ দেশে বাংলার সম্মানকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং ভারতীয় নারীরা পরিবর্তনের এবং রাষ্ট্র নির্মাণের অগ্রণী হয়ে রাষ্ট্রকে নতুন দিগন্ত দিচ্ছে, যা খুবই আনন্দ ও গর্বের। ■

শোকসংবাদ

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সৎসঙ্গ প্রমুখ, বিশ্ব হিন্দু বার্তা এবং স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি ভাস্কর দাসের মাতৃদেবী মল্লিকা দাস গত ১৭ই মার্চ (২রা চৈত্র) মঙ্গলবার সকাল ১১টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সাধনোচিত পরমধামে গমন করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। এক পুত্র দুই কন্যা, এক জামাতা ও পাঁচ নাতি নাতনী এবং অনেক গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন রেখে গেলেন।

নদীয়া জেলার বীরনগরের প্রাচীন 'উলাইচণ্ডী মা'

সুকন্যা পাল

উলাইচণ্ডী দেবী হলেন নদীয়া জেলার বীরনগরের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ৫০০ বছরের বেশি পুরনো লৌকিক হিন্দু দেবী। বীরনগর হল নদীয়া জেলার একটি প্রাচীন শহর। যার পূর্বনাম ছিল উলা। এককালে দস্যু দমনে স্থানীয় যুবকদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বীরনগর (বীরদের শহর) নামে পরিচিতি পায়। বীরনগরের প্রাচীনকালের নাম ছিল উলা। এই নাম নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কারো মতে নদীর স্রোতধারার চরে উলুখড়ের বন ছিল। উলুখড়ের বাণিজ্য থেকে এই জনপদটি গড়ে ওঠে উলা গ্রাম নাম হয়। কারো মতে উলা আরবি শব্দ। যার অর্থ শ্রেষ্ঠ বা জ্ঞানী। একদা বহু পন্ডিত লোকের বাস ছিল তা থেকেই নাম হয় উলা। আবুল ফজলের 'আইনী আকবরীতে' বত্রিশ মহলের মধ্যে একটি গ্রাম 'উলা'র উল্লেখ আছে। আজ উলা গ্রাম বীরনগর নামে বেশি পরিচিত। উলার নাম বদলের সাথে ব্রিটিশ আমলের ঘটনা যুক্ত আছে। কথিত আছে ভয়ঙ্কর ডাকাতদের অত্যাচারে ব্রিটিশ সরকার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। উলা গ্রামের বাসিন্দারা সেই অত্যাচারী ডাকাতদের ধরে ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেয়। এই গ্রামের বাসিন্দাদের সুকৃতি হিসেবে উলা নামের বদলে এই গ্রামের নাম রাখা হয় বীরনগর। বীরনগর (উলা) শহরের বিশেষ পরিচিতি উলাইচণ্ডী পুজো ও এই পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার জন্য। ১৮২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে উলার দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

অম্বিকা পশ্চিম পাড়ে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিলা দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলায় গতি, বট মূলে ভগবতী,
যথায় পাতকী নহে ছাড়।
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়,
পূর্ণিমা তিথির পূণ্য চয়।
নৃত্য গীত নানা নাট, দ্বিজ করে চন্ডীপাঠ,
মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়।

উলাইচণ্ডী দেবীর উৎসব ও জনপ্রিয়তা একসময় এই অঞ্চলের অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবী থেকে বেশি ছিল। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের বাংলার লোকায়ত ধর্মাচরণের সঙ্গে এই দেবীর গভীর সম্পর্ক আছে। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর বারোয়ারি বা সার্বজনীন পূজা করা হয়ে থাকে। প্রাচীন লৌকিক এই উলাইচন্ডী দেবীকে কেন্দ্র করে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বিশাল মেলার আয়োজন করা হয় এবং এই মেলাতে হাজার হাজার মানুষের সমাগমও দেখা যায়। কথিত আছে এখানে আগে মহিষ বলি হত। বীরনগরে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন উলাইচন্ডী দেবী ছাড়াও আরো তিনজন দেবী পূজিত হন—মহিষমর্দিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, গণেশজননী দেবী দুর্গা।

কথিত আছে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর বা মতান্তরে শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্য তরী নিয়ে যাওয়ার সময় উলা গ্রামে কালবৈশাখীর ঝড়ে বিপদে পড়েছিলেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি শিলাখণ্ডে পূজা করলে দুর্যোগ কেটে যায় এবং তরী রক্ষা পায়। সেই দিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। বিপদমুক্তির জন্য শ্রীমন্ত সদাগর ওই বৈশাখী পূর্ণিমার দিন চণ্ডীমায়ের পুজো করেন। সেই থেকেই এই পুজোর সূচনা বলে জনশ্রুতি। আজও বৈশাখী পূর্ণিমার দিন উলাইচণ্ডী মায়ের পূজো হয়ে থাকে। অন্য মতে ঝড়ে পাড়ে বেঁধে রাখা শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা ডুবে যায় এবং তিনি রাত্রি বাস করতে বাধ্য হন। তখন তিনি ওলা ওলা নামে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। চণ্ডীমায়ের পুজো দিয়ে সুস্থ হন বলে তিনি পুজোর নামকরণ করেন উলাইচণ্ডী। প্রতিবছর শুক্লপক্ষের পূর্ণিমাতে মা উলাইচণ্ডীর মেলা উপলক্ষে প্রচুর লোকের ভিড় হয়। প্রত্যেক বছর বুদ্ধ পূর্ণিমার পূণ্য লগ্নে পুণ্যতিথিতে উলাইচণ্ডী মায়ের পুজোকে চিরাচরিত প্রথা হিসেবে মেনে চলে আসছেন বীরনগরের অধিবাসীগণ। উলাইচণ্ডী মায়ের মেলাতে এই শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর পাশাপাশি নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ পূর্ণিমার পূণ্য লগ্নে শ্রীশ্রীচণ্ডী মাতার পুজো দিয়ে শুরু করে শ্রীশ্রীবিন্ধ্যবাসিনী এবং শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী মাতার পূজার্চনা বীরনগরবাসীর কাছে এক জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উলাইচণ্ডী মেলাকে অনেকে জাতের মেলাও বলে

থাকেন। ধনী-দরিদ্র জাত নির্বিশেষে এই মেলায় ভিড়ের পরিমাণ এতই বেশি হত যে এই মেলায় গেলে জাত রক্ষা করা কঠিন ছিল বলে প্রচলিত ছিল। তাই এই মেলাকে জাতের মেলাও বলা হয়ে থাকে। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজমহিষীদের উলোর জাতের মেলাতে গিয়ে অতিরিক্ত ভিড়ে সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে সেখানে না পাঠিয়ে রাজবাড়ির মাঠে বারোদলের মেলা বসানোর ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই মেলাটি যেহেতু বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন হয় এবং জাতের মেলার নামের সঙ্গে যাতকের নামের মিল রয়েছে তাই উলাইচণ্ডী মেলার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন। এলাকার লোকেরা জানান মা উলাইচণ্ডী খুব জাগ্রত। এখানে মানত করে যারা যারা ফল পেয়েছেন, তারা অনেকে পাঠা বলি বা নানারকম পূজার্চনার মধ্য দিয়ে তাদের মানত পালন করেন। উলাইচণ্ডী হচ্ছে বৌদ্ধ প্রভাবিত দেবী পূজা পদ্ধতি। বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে শুরুতে এই পূজা দলিত, হাড়ি সম্প্রদায়ের ছিল, কিন্তু আপদ বিপদে সব সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দেবীর কাছে মানত করতেন। এখনো তা প্রচলিত রয়েছে। জনশ্রুতি আছে ওলাওঠা (কলেরা) রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই দেবীর পূজা করা হতো বলে তিনি উলাইচণ্ডী দেবী নামে বিশেষ পরিচিত। যিনি হলেন রক্ষাকারী দেবী। পাল যুগের পর রাজা শশাঙ্কের আমলে জাতিভেদ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত ছিল। নিম্ন ও উচ্চবর্ণের ভেদাভেদ চলে গিয়ে আত্মার মিলন ঘটে। উলা গ্রামের উলাইচণ্ডী পূজার মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটে। হাড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই পুজোকে আঁকড়ে ধরলেও এই পূজা ক্রমে হস্তান্তর হতে থাকে। নদীয়া রাজ রাঘব রায় এই পুজোকে শক্তি দেবী পুজোয় রূপান্তরিত করে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে হাড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা, তারপর নদীয়ার রাজারা, তারপর মুস্তফীরা এবং তারপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দেবীর পুজো করেন।

দেবী উলাইচণ্ডীর মূর্তি বলতে বটবৃক্ষের নিচে সেই সময় থেকে আজও রয়েছেন একখণ্ড মসৃণ কালো পাথরখণ্ড বা শিলাখণ্ড। এই শিলাখণ্ডই জাগ্রত দেবী হিসেবে বীরনগরবাসীর কাছে পূজিত হন। সব অনুষ্ঠানে এই দেবীকে সবার আগে পুজো করা এই অঞ্চলের বিশেষ রীতি। কাছেই একটি বটবৃক্ষে মনস্কামনা পূরণের জন্য মাটির টিল বাঁধা প্রাচীন রীতি, যা আজও সেখানে প্রচলিত আছে। এই পুজো উপলক্ষে বিশেষ মেলার আয়োজন থাকে। এই মেলা থেকে মানুষ সারা বছরের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। এই মেলায় শ্রীমন্ত সদাগরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যারা পসরা সাজিয়ে বাণিজ্য করতে আসে প্রত্যেকেই হাসিমুখে বাড়ি ফেরে। বুদ্ধ পূর্ণিমার আগের দিন এক পশলা বৃষ্টি হয়, বলা হয় মা উলাইচণ্ডী তার বেদি ভক্তদের জন্য ধুয়ে দেন। বর্তমানে প্রাচীন বটবৃক্ষের সারির মাঝেই বাঁধানো অবস্থায় আছে দেবীর বেদীতল। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভোর থেকে পুজো শুরু হয় আর এই পুজো ঘিরে বেশ বড় এলাকা জুড়ে মেলা বসে। তবে মেলা একবেলার মেলা। বলিপ্রথা আজও এখানে প্রচলিত রয়েছে। স্থানীয় মানুষদের একবেলাতে মেলা শেষ হয়ে যাওয়ায় মনে কষ্ট ছিল। তাই চণ্ডী দেবীর পুজো শেষে কোথাও বিন্ধ্যবাসিনী, কোথাও মহিষমর্দিনী ইত্যাদি দেবীর চার দিনের পুজো হয়। সেখানেও মেলা বসে। প্রধানত শিলাখণ্ডই দেবী চণ্ডী রূপে পূজিত হন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ২৯ এপ্রিল চণ্ডীমাতার বহু প্রাচীন শিলারূপটি নিখোঁজ হয়। বহু সন্ধানেও এই শিলারূপটি পাওয়া যায়নি। অবশেষে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার প্রধান পণ্ডিতের বিধান অনুসারে ঐ বছরেই ১৫ই মে ঘট স্থাপন করে পূজা শুরু হয়। ঘটের পাশে বেশ কিছু শিলাখণ্ড স্থাপন করে পুজো শুরু করা হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে সংকল্প করে ঘট পুজোর সূচনা করা হয়। পূর্বে এই পুজোর দিন এই গ্রামে আরো কয়েকটি পুজো মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হত। এগুলো দক্ষিণপাড়ার মহিষমর্দিনী, উত্তরপাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী, পালিতপাড়া, মুহুরিপাড়া ও ডোমপাড়ায় দশভূজা দুর্গা এবং মাঝেরপাড়ায় গণেশ জননী পুজো। বর্তমানে উত্তরপাড়ার বারোয়ারি বিন্ধ্যবাসিনী ও দক্ষিণপাড়ার মহিষমর্দিনী পুজো এখনো প্রচলিত রয়েছে। সেই সময় পুজো উপলক্ষে যাত্রা, খ্যামটা, খেউর, বাইনাচ, কবিগান, ঝুমুর তরজা, প্রভৃতি বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন থেকে পরপর চারটি দিন বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে মেলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই পুজোর মেলা যে বেশ আকর্ষণীয় ছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ প্রায় ২০০ বছর আগে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ই মে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত উলাইচণ্ডী মেলার বিবরণীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

'২৮ বৈশাখ ৯ই মে রবিবার বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলা নামে এক স্থানে বার্ষিক চণ্ডী পূজা হইবেক এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণপাড়ায় মহিষমর্দিনী পূজা ও মধ্যপাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশ জননী পূজা। অনেক স্থানে বারোয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।'

এখনো বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় পূর্ণিমার শুরু থেকেই উলার চণ্ডীতলায় ঘন্টাধ্বনি বেজে ওঠে। শোনা যায় উলুধ্বনি ও চণ্ডীপাঠ। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। বহু ইতিহাসের সাক্ষী প্রাচীন বটগাছের ঝুড়িতে মনস্কামনা পূরণের জন্য ঢিলও বেঁধে যান বহুভক্ত। প্রাচীন বটগাছগুলো মানুষের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলোকে সানন্দে ধারণ করে। ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও ইতিহাসের মিলনে আজও বীরনগরের উলাইচণ্ডী পুজো, এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসব। উবীরনগরের এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজো ও মেলা দেখতে প্রতি বছর বহু ভক্তের সমাগম হয়। এটি নদীয়া জেলার প্রাচীনতম লৌকিক দেবী পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এই মেলা কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে। ■

বেলডাঙার ঘটনা আর কতদিন চলবে?

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা শহরে এর আগেও হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। বারে বারে বেলডাঙা এই একই কারণে খবরে উঠে এসেছে। আবার বেলডাঙা হিংসার আগুনে জ্বলছে। ১৬ই জানুয়ারি এক উন্মত্ত মুসলিম জনতা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ঘটনাটা ঘটেছে এক পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুর পরে। বেলডাঙার বাসিন্দা আলাউদ্দিন ঝাড়খণ্ডের ডাল্টনগঞ্জে ১০ দিন আগে ফেরিওয়ালার কাজে গিয়েছিল। ১৫ই জানুয়ারি তাকে তার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অভিযোগ যে আলাউদ্দিন মৃত্যুর আগে তার মাকে ফোনে জানিয়েছিল সে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের কারণে উদ্বেগে আছে। তার মরদেহ বেলডাঙায় পৌঁছালে স্থানীয় মুসলমানরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে। তারা প্রথমেই তার শবকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এনে রাখে। তারপর স্থানীয়রা শিয়ালদহ লালগোলা রুটে অনেকগুলো ট্রেন আটকে দেয়।

তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা কয়েকজন সাংবাদিককে মারধর করে। সংবাদচিত্রীরাও ছিলেন। তারা এমনকি মহিলা সাংবাদিকদেরও যৌন হয়রানি করে। এইরকমই একটা ঘটনা—সোমা মাইতি নামে জি ২৪ ঘণ্টা সংবাদ চ্যানেলের একজন মহিলা সাংবাদিকের নিগ্রহের ঘটনা। তাঁকে ঘুঁষি মারা হয়, লাথি মারা হয় এবং রাস্তার মাঝখানে যৌন আক্রমণ করা হয়, তাকে ধর্ষণের চেষ্টা হয়। যখন সে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে, তখন তারা তার পিছনে ধাওয়া করে। এই সাংবাদিককে তারপর এক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, ''আমি সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেভাবে আমাকে মারা হয়েছে তা আমি কথায় বলে বোঝাতে পারব না। আমার সাংবাদিকতার এই এতগুলো বছর আমি কখনো এমন যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়িনি। দুজন লোক আমার দুটো পা চেপে ধরে, একজন আমার চুল ধরে হিড় হিড় করে টানছিল আর একজন আমার কাপড় ধরে টানছিল।''

আশ্চর্যের কথা যখন এই আক্রমণ চালানো হচ্ছিল তখন সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। ঘটনার পরে পরেই কোন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরে এই খবর করা হয়েছিল যে মূল অভিযুক্ত মতিউর রহমান এই সহিংসতায় প্ররোচনা দিয়েছিল, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রহমান ছাড়া আরো তিনজনকে বিশেষ করে সোমা মাইতিকে আক্রমণের কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে যে, মুসলিম জনতা ১৬ই জানুয়ারি সহযোগিতা করেছিল, তারা আক্রমণাত্মক ছিল না। এমনকি মুর্শিদাবাদের এসপি কুমার সানি রাজ

এও বলেছেন যে কেউ নাকি আহত হয়নি। এত কিছুর পরেও!

পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বেলডাঙায় সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, ''আমি বিনীতভাবে সাংবাদিকদের বলব এই উত্তপ্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময়ে যেন সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।'' তিনি এই প্রস্তাবও দেন যেন সাংবাদিকরা জনগণের আবেগের বিষয়ে সতর্ক থাকেন এবং 'এই জনতা'কে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি আরো সাবধান করে বলেছেন, ''আপনাদের কোন শিথিল বক্তব্যকে কেউ নেতিবাচক দিকে নিয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন জনতার কোন দিক ঠিক থাকে না।'' এর মানে কী?

এর একদিন পরে ১৭ই জানুয়ারি এক মুসলিম জনতা বেলডাঙার বড়ুয়া মোড়ে দাঙ্গা বাঁধায়। এইবার অস্থিরতা সৃষ্টির পিছনে অজুহাত ছিল বিহারের মধ্যমপুরে আনিসুর রহমান নামে আরেকজন পরিযায়ী কর্মীর উপর কথিত আক্রমণ। রহমান যখন দেশের বাড়ি ফেরেন, তখন তার শরীরে নাকি তীব্র আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার দাবি, ''একদল লোক আমাকে লাথি মেরেছিল, লাঠি দিয়ে আমাকে পিটিয়েছিল। তারা শুক্রবার আমার পরিচয় পত্র দেখেই এটা করেছিল।''

এবার বেলডাঙার হামলাকারীরা রেলের সিগন্যালিং সিস্টেমকে তছনছ করে। ফলে রেল কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা পর্যন্ত ট্রেন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। এক বিশাল রেল পুলিশ বাহিনীকে সেখানে পাঠাতে হয় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে। এই আক্রমণ ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। তারা রেলের সিগন্যাল পোস্ট উপড়ে ফেলা থেকে সরকারি বাস আক্রমণ করা প্রায় সর্বত্র একটা অরাজকতা তৈরির ষড়যন্ত্র করেছিল। এসপি মুর্শিদাবাদ কুমার সানি রাজ খবর দিয়েছেন, একটা বাসকে তছনছ করে জনতা পাথর ছুঁড়েছে। বাসের পাঁচজন যাত্রী আহত হয়েছেন। তিনি বিশেষ ভাবে বলেছেন যে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছিল ও লাঠি চার্জ করতে হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৩৫ মিনিট সময় লেগেছিল। তিনি আরো বলেন যে ঘটনাস্থল থেকে ৩০জন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ঘটনার বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন হিন্দুদের বাড়িঘর ও দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৭ই জানুয়ারি তিনি জানিয়েছেন যে হিন্দুদের সম্পত্তি ও ব্যবসার জায়গা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চালানো হচ্ছে কারণ পশ্চিম বাংলার বাইরে পরিযায়ী সমস্যা তারা মানছে না। শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ''এটা কোনও স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ ছিল না। সিএএ ও ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে যেভাবে মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল, এটা ছিল তারই পুনরাভিনয় এবং হিসাব করে করা। তখন নিরীহ গোবিন্দচন্দ্র দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসকে পদ্ধতিমাফিক নিশানা করে মারা হয়েছিল। হিন্দুদের বাড়িঘর ও জীবিকাস্থল ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছিল, আর রাজ্য সরকার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। আবার সেই এক জঘন্য ছক, পুলিশ এই নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছিল কারণ তারা এতে জড়িত ছিল রাজ্য সরকারের নির্দেশে, দাঙ্গাবাজ ও লুটেরাদের নির্ভয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যেতে দিয়েছিল। কারণ মমতা ব্যানার্জির ভোট ব্যাঙ্ককে চটানো যাবে না। ২০২৪ সালে নভেম্বরে এইভাবেই মুসলমান জনতা হিন্দুদের বাড়ি জ্বালিয়েছিল। কার্তিক পুজো করা যাবে না। আসলে কার্তিক পুজো নয় এটা শুরু। ওরা বলতে চায় কোন পুজোই করতে দেবে না। একদল লোক হিন্দুদের ধর্মপালনে বাধা দেবে এবং শেষ পরিণতি হিন্দু ধর্মটাই থাকবে না। আমরা কতকাল নীরব দর্শক থাকব? সবাইকে একটা জায়গায় আসতে হবে। অনেক হয়েছে। ■

রামনবমীর শোভাযাত্রা, দুর্গাপুর নগর, মধ্যবঙ্গ

হিন্দু স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ : শতভাগ ভোট নিশ্চিত করতে হিন্দুদের এগিয়ে আসতে হবে - ভিএইচপি

কলকাতা, ১ এপ্রিল, ২০২৬। ভিএইচপি আজ জানিয়েছে যে, শ্রদ্ধেয় সাধু, মহাত্মা এবং বিপ্লবীদের পবিত্র ভূমি বাংলাকে এখন হিন্দু-বিরোধী ও দেশ-বিরোধী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। ভিএইচপি-র কেন্দ্রীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমিলিন্দ পারান্দে বলেছেন যে, রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং হিন্দু মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য শতভাগ ভোট নিশ্চিত করতে হিন্দু সম্প্রদায়কে এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে, ভিএইচপি বাংলা এবং দেশজুড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক হাজার হাজার সেবামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। শুধুমাত্র গত কয়েক মাসেই, দেশজুড়ে মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য আয়োজিত হাজার হাজার সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে হাজার হাজার যুবক-যুবতী মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। ভগবান শ্রীরামের জন্য একটি বিশাল মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি, ভিএইচপি কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে গো-সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সামাজিক সমতার প্রসারে নিয়োজিত রয়েছেন।

এখানে একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন যে, বাংলা ক্ষুদিরাম বসু, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বহু বিপ্লবী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায়ের মতো সমাজ সংস্কারক এবং স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো গুণী সাধকদের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্র। এই ভূমি মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত এবং নীরা আর্যের মতো মহীয়সী নারীদেরও জন্ম দিয়েছে এবং বাংলার এই পবিত্র ভূমি মহান কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও জন্ম দিয়েছে, যিঁনি কালজয়ী কবিতা 'বন্দে মাতরম' রচনা করেছিলেন।

বঙ্গ বিভাজন আন্দোলন, ভারত বিভাজনের মর্মান্তিক ঘটনা এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় এখানকার হিন্দু সম্প্রদায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শতাব্দী ধরে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিম আক্রমণকারী, ব্রিটিশ অত্যাচারী এবং নকশালদের দ্বারা নিপীড়িত ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। তবে, তারা সাহসিকতার সঙ্গে তাদের সকলকে প্রতিহত করেছে। রাম নবমী, হনুমান জন্মোৎসব, সরস্বতী পূজা বা দুর্গাপূজা, যাই হোক না কেন, বর্তমান রাজ্য সরকার প্রথমে আমাদের সেগুলো উদযাপন করতে দেয় না, এবং আদালত থেকে অনুমতি দেওয়া হলেও ভক্তদের পাথর ছোঁড়া ও আক্রমণের শিকার হতে হয়। এই বছর রাম নবমীতে জিহাদি শক্তিরা মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া এবং বীরভূম জেলায় হামলা চালিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এই হামলাগুলো আরও অনেক জায়গায় এবং আরও গুরুতরভাবে ঘটেছিল। তবে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও রাজ্য হাইকোর্টের সাহসী সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসনীয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যবশত, এই সময়েও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিকামী হিন্দু সম্প্রদায় অসংখ্য আক্রমণ এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে হিন্দুরা হিন্দু উৎসব, মিছিল, মন্দির, মূর্তি, বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ, ধর্মান্তর, গো-হত্যা, সীমান্ত পারাপার করে গরু পাচার, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতাসহ বহুবিধ দুষ্টচক্রের সাথে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছেন। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা তাদের জিহাদি তোষণে গভীরভাবে নিমজ্জিত। অনুপ্রবেশের এই গুরুতর সমস্যা শুধু সম্পদকেই নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলেছে।

শ্রীপারান্দে বলেন যে, এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য রাজ্যের জনগণের জন্য গণতন্ত্রের উৎসব, অর্থাৎ ভোটের উৎসব শীঘ্রই আসছে। এটি একটি হিন্দু-বান্ধব সরকার নির্বাচিত করার এক সুবর্ণ সুযোগ, যা আমাদের জাতীয় উৎসবের পাশাপাশি নির্ভয়ে বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং উৎসব উদযাপন করার সুযোগ দেবে।

রাজ্যের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি অনুরোধ করেন যে, এসআইআর ((জ্জট্ট) প্রক্রিয়ার অধীনে যোগ্য ভোটারদের অবশ্যই সময়মতো ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং হিন্দুদের স্বার্থে শতভাগ নির্ভয়ে ভোট দিতে হবে। হিন্দুদের স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ; এতে কারও কোন ক্ষতি হয় না।

প্রস্তাবক—
বিনোদ বনসাল
জাতীয় মুখপাত্র, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

সুন্দরবন জেলার রামনবমী

গত ২৯শে মার্চ ২০২৬ তারিখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবন জেলার পরিচালনায় রামনবমী উপলক্ষে এক বিরাট ধর্মীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি শোভাযাত্রা ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে বিষ্ণুপুরে মিলিত হয়। এরপর একত্রিতভাবে শোভাযাত্রাগুলো মথুরাপুর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুন্দরবন জেলা কার্যালয় হয়ে বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায় ২৫টা মূর্তি সহ ৪০টি গ্রাম সমিতি অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ৫০ হাজার সনাতনী মানুষের সমাগম ঘটে এই শোভাযাত্রায়। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুন্দরবন জেলায় ১৭৪ স্থানে মহোৎসব পালিত হয়। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক পলাশ নাইয়াঁ। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত থেকে এই পুণ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত দুর্গাবাহিনীর সংযোজিকা সুশ্রী পারমিতা পাল এবং ব্রততী আচার্য। বজরঙ্গ দল ও দুর্গাবাহিনী অন্যান্য কার্যকর্তাদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাতৃ সম্মেলন ও বসন্ত অনুষ্ঠান

গত ১১ই মার্চ ২০২৬ তারিখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তির উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে এক গৌরবময় মাতৃ সম্মেলন ও বসন্ত অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনটি ছিল এক গভীর ভাবগম্ভীর ও সাংগঠনিক গুরুত্ববাহী সমাবেশ, যেখানে সমাজে নারীর জাগরণ, সমাজের উন্নয়ন এবং জাতির সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত সম্মেলনের সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের মাতৃশক্তির প্রান্ত টোলি, সংযোজিকা শ্রীমতী সুমন শ্রীবাস্তব। এছাড়াও সৎসঙ্গ প্রমুখ শ্রীমতী পারমিতা গুচাইত এবং বাল সংস্কার প্রমুখ শ্রীমতী সুজাতা সাহা সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যক্রম সুসংগঠিতভাবে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅজয় গোয়েল জি, যিনি এই মাতৃ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তির পালক মাননীয় শ্রীজয়দেব সাহা। তদুপরি উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সম্পাদক মাননীয় শ্রীচন্দ্রনাথ দাস মহাশয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠনমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমানিকচন্দ্র পাল, দুর্গা বাহিনীর ক্ষেত্র সহ সংযোজিকা মাননীয়া শ্রীমতী ঋতু সিং, পূজ্য নির্গুণানন্দ মহারাজ এবং সাধ্বী মামনি। তাঁদের উপস্থিতি সম্মেলনকে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত ও অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলে। সার্বিকভাবে এই প্রান্ত সম্মেলন ও বসন্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, সফল ও অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সকলের মনে এক নব উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে।

ব্যারাকপুর জেলার কাঁকিনারা প্রখণ্ডে দুর্গাবাহিনী ও বজরঙ্গ দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিগত ১৬/৩/২০২৬ তাং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ব্যারাকপুর জেলার কাঁকিনারা প্রখণ্ডে দুর্গাবাহিনী ও বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে একটি প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। কার্যক্রমটি মূলতঃ স্কুলের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাগ্রত করার জন্য করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে ও প্রতিবাদে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছেলে, মেয়েদের Self defence-এর ওপরেও বিশেষ আকর্ষণীয় কার্যক্রম করা হয়, যা সমাজকে কল্যাণকর, সংস্কারময় এবং নারী সশক্তিকরণের বার্তা প্রদানকারী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মাননীয় মানিকচন্দ্র পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা সুশ্রী পারমিতা পাল, বালসংস্কার কেন্দ্র প্রমুখ শ্রীমতি ব্রততী আচার্য, RSS-এর বিভাগ কার্যবাহ মাননীয় জয়দেব মণ্ডল, বিভাগ বজরঙ্গ সংযোজক মাননীয় বিকাশ রাজভর, জেলা বজরঙ্গ সংযোজক মাননীয় রাজেশ মিশ্রা, জেলা দুর্গাবাহিনী সহ-সংযোজিকা সুশ্রী রাগিনী রাজভর, জেলা বরিষ্ঠ কার্যকর্তা মাননীয় আনন্দ গুপ্তাজির সক্রিয় ভূমিকা অনুষ্ঠানটিকে মহিমামণ্ডিত করে তোলে। এছাড়াও জেলা সভাপতি, সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক আসন অলংকার করেন। বজরঙ্গ দল ও দুর্গাবাহিনীর অদম্য প্রয়াসে অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা এনে দেয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-ত্রিপুরা প্রান্ত, সেবা বিভাগ দ্বারা দুই দিবসীয় সেবা কুম্ভ কার্যক্রম

সেবা কার্যের দৃষ্টিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সেবা বিভাগ দ্বারা সঞ্চালিত প্রকল্পগুলোকে সাথে নিয়ে মোট ৮টি ছাত্রাবাস, ৫টি বিদ্যালয়, ২৫টি স্বয়ংসেবী সংস্থা সমূহকে নিয়ে ১৪ই এবং ১৫ই মার্চ ২০২৬ দুই দিবসীয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খয়েরপুর স্থিত সেবাধামে এক সেবা কুম্ভ কার্যক্রমের উদ্ঘাটন দ্বীপ প্রজ্জ্বলন এবং রাষ্ট্রীয় গীত 'বন্দেমাতরম'-এর মাধ্যমে হয়।

এই সেবা কুম্ভ কার্যক্রমটি ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্যক্রমের প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত সুধাংশু দাস মহোদয় (তপশিলি জাতি কল্যাণ ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উন্নয়নমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার)। তাছাড়া মুখ্য বক্তা ছিলেন (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গৌহাটি ক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী) ডক্টর দীনেশ তেওয়ারী মহোদয়, উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন (গৌহাটি ক্ষেত্র সেবা প্রমুখ) শ্রীযুক্ত বিকাশ কৌশিক মহোদয়, তাছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা (প্রান্ত সভাপতি) শ্রীযুক্ত শচীন কলই মহোদয়, (**D.M** পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা) শ্রীযুক্ত বিশাল কুমার মহোদয়, (পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি) শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ শিল মহোদয় এবং সমাপনী কার্যক্রমে (২য় দিন) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত বিকাশ দেববর্মা মহোদয় (জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার) এবং (খয়েরপুর বিধানসভার বিধায়ক) শ্রীযুক্ত রতন চক্রবর্তী মহোদয়। এই সেবা কুম্ভে ২৫০টি জনজাতি ছাত্রাবাসের শিশু অংশগ্রহণ করেছিল, গো-প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসা শিবিরও ছিল। ৫০টিরও বেশি গো-মাতার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা কাজে নিযুক্ত এইরকম ২৫টি **NGO** এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা বিভাগের এই সেবা কুম্ভে সম্মানিত এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

এই সেবাকুম্ভ কার্যক্রমের সঞ্চালন করেন শ্রীযুক্ত সুকেশ কলই মহোদয় (প্রান্ত সহ-মন্ত্রী) এই সেবা কুম্ভ কার্যক্রমের সর্বব্যবস্থা প্রমুখ ছিলেন শ্রীযুক্ত অমল কান্তি দাশ মহোদয় (প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ)। তাছাড়া এই সেবা কুম্ভ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন (প্রান্ত সেবা প্রমুখ) শ্রীযুক্ত জয়ন্ত চক্রবর্তী মহোদয়, (প্রান্ত সহ-সেবা প্রমুখ) শ্রীযুক্ত রাজীব দত্ত মহোদয়, (প্রান্ত সহ-সভাপতি) শ্রীযুক্ত ভানু পদ চক্রবর্তী মহোদয়, (প্রান্ত সহ-সভাপতি) শ্রীমতি তপতী কলই মহোদয়া, (প্রান্ত মন্ত্রী) শ্রীযুক্ত শংকর রায় মহোদয়, (প্রান্ত সহ-মন্ত্রী) শ্রীযুক্ত মনোজ দেবনাথ মহোদয়, (প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী) শ্রীযুক্ত শশীকান্ত পান্ডে মহোদয়, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র পাল মহোদয়, শ্রীযুক্ত চিত্তেশ দাশগুপ্ত মহোদয়, শ্রীযুক্ত অরূপ দেবনাথ মহোদয়, শ্রীযুক্ত বিকাশ ভৌমিক মহোদয়, শ্রীযুক্ত অভিনাশ কৃষ্ণ দাস মহোদয় এবং বজরং দল, দুর্গাবাহিনী, মাতৃশক্তি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্ত জেলা এবং প্রখণ্ড স্তরের সকল কার্যকর্তা ও কার্যকর্ত্রীবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে এবং সমাজের বরিষ্ঠ নাগরিক ও গণমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্তের সেবা বিভাগের দ্বারা আয়োজিত সেবা কুম্ভ কার্যক্রমটি খুব সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হয়।

রামনবমীর শোভাযাত্রা

রামনবমী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন জেলাগুলোতে শোভাযাত্রা এবং মহোৎসব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হয়। যেমন—

■ **দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত :** প্রতি বছরের ন্যায় হাওড়া মহানগরে রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় এবং আদালতের আদেশে নির্ধারিত যাত্রাপথে শোভাযাত্রা করা হয়। এছাড়া কাঁকিনাড়া, সুন্দরবন জেলার মথুরাপুরে, খড়দহ, গঙ্গাসাগর জেলা, ব্যারাকপুর জেলা, বেহালা, উত্তর কলকাতা, হাওড়া গ্রামীণ জেলা, মেদিনীপুর জেলা, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। জেলা এবং প্রান্তের কার্যকর্তাদের অংশগ্রহণ দেখবার মতো ছিল।

■ **মধ্যবঙ্গ প্রান্ত :** এই বছর রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা মোড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর জিহাদিরা আক্রমণ করে। ফলে প্রায় ১৫ জন মানুষ আহত হয়। দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়, ফলে সি.আর.পি.এফ এবং আর.এ.এফ-কে নামানো হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা শাসককে একটি প্রতিবাদ পত্র দেওয়া হয়। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার ভোলাঢাড়া গ্রামের রাস্তায় রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর পাথর ছোঁড়া হয়। কিন্তু শোভাযাত্রা থেকে প্রতিবাদ জানালে জিহাদিরা পালিয়ে যায়। এছাড়া কৃষ্ণনগর, ব্রহ্মপুর, রামপুরহাট, রানীগঞ্জ, শ্রীরামপুর, পুরুলিয়া শহর, চুঁচুড়া, দুর্গাপুর, লালবাগ প্রভৃতি জেলাগুলোতে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে শোভাযাত্রা এবং রাম মহোৎসব পালন করা হয়। প্রান্তের অধিকারীরা নিজ নিজ জেলাতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

■ **উত্তরবঙ্গ :** প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দ্বারা আয়োজিত রামনবমী শোভাযাত্রা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই মহা ধুমধামের সহিত আয়োজিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে বিধর্মীপ্রধান জেলা ঈশ্বরপুর ও নকশালবাড়ী প্রখণ্ডতে আয়োজিত রামনবমী শোভাযাত্রায় লক্ষাধিক ব্যাক্তির সমাগম উল্লেখ করতেই হয়। এছাড়া কোচবিহার জেলায় আয়োজিত রামনবমী শোভাযাত্রায় ২৫ হাজারের অধিক জনসমাগম হয়। সমগ্র শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু বার্তার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক, সহঃ প্রচার ও প্রসার প্রমুখ উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত শ্রী শ্রীকান্ত ঘোষ এবং তিন বঙ্গের অর্চক পুরোহিত প্রমুখ শ্রীঅরচনজী মহাশয়। উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শোভাযাত্রাটি আয়োজিত হয় শিলিগুড়ি নগরে এই শোভাযাত্রায় কমপক্ষে ৬ লক্ষ জনসমাগম দ্বারা আয়োজিত হয়। এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহঃ সরকার্য্যবাহক মাননীয় শ্রীরামচন্দ্র চক্রধরজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহঃ ক্ষেত্র প্রচারক মাননীয় শ্রীজলধর মাহাতো, মাননীয়া মাতা সাদ্ধী প্রাচী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসোহান সিং সোলাঙ্কিজী, উওরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅনুপ মণ্ডল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উওরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত সম্পাদক মাননীয় শ্রীলক্ষ্মণজী বনসল।

■ **বহরমপুর :** প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে বহরমপুর শহরে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে সুবিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। সেরকম কোনো প্রচার ছাড়াই শোভাযাত্রায় ২২ হাজারের ওপর ভক্তদের উপস্থিতি নজর কাড়ার মতো। শুধু তাই নয়, রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার ভক্তদের জয়ধ্বনি ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দিলো যে বর্তমান বঙ্গে হিন্দুত্বের ব্যাপক জাগরণ ঘটেছে। এই শোভাযাত্রা ওয়াই.এম.এ ময়দান থেকে শুরু করে মোহন মল হয়ে খাগড়া চৌরাস্তা ঘুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে ফিরে এসে প্রায় ৩০ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি শ্রীমতি সুনন্দা ঠাকুর, ব্রহ্মপুর জেলার সংগঠন সম্পাদক শ্রীরণজিত প্রামাণিক, সম্পাদক শ্রীসুখদেব মণ্ডল, বিধি প্রকোষ্ঠের প্রমুখ শ্রীসন্তোষ সূত্রধর, সামাজিক সমরতার প্রমুখ শ্রীসন্তোষ রজক, মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর সংযোজিকা শ্রীমতি কণিকা রায় ও অর্পিতা মণ্ডল সঙ্গে শ্রীজয়ন্ত দাস, শ্রীবাবলু দাস এছাড়াও জেলা ও নগরের অন্যান্য কার্যকর্তাগণ।

एक संत की अद्भुत वसीयत

स्वामी रामसुखदास जी महाराज पर विशेष

दुनियां में जब भी कोई वसीयत लिखी जाती है या वसीयत का जिक्र भी होता है तो सबसे पहले जेहन में धन संपत्ति के बंटवारे की बात आती है मगर एक वसीयत दुनियां में ऐसी भी हुई है जिसको लिखने वाले के पास 1 रुपये की भी संपत्ति न हो कोई जमीन जायदाद नहीं हो कोई बैंक बैलेंस न हो कई कोठी बंगला खेत या घर न हो और फिर भी उसने वसीयत लिखी हो है न आश्चर्य की बात ऐसी ही एक अद्भुत वसीयत लिखी गई थी कुछ पर्ष पूर्व और उस वसीयत लिखी गई थी कुछ वर्ष पूर्व और उस वसीयत की 8 लाख से भी अधिक प्रतियां बिक जाए जिनकी वसीयत को 40 बार पुनर्मुद्रित करना पड़ा जिनकी वसीयत का बहुत से भाषाओं में अनुवाद किया गया हो ऐसी अद्भुत और दिव्य वसीयत दुनियां में शायद ही किसी व्यक्ति की रही हो जिनकी वसीयत की प्रति को संग्रहालय में संग्रहित कर रखी हो सोच कर देखिए वह व्यक्ति कितना बिरला और असाधारण होगा। आखिर कौन था वह व्यक्ति और ऐसा भी क्या था उस वसीयत में जिसके कारण वह दुनियां की सबसे दुर्लभ और अद्भुत वसीयत बन गई है। जी हां वह थे इस कलयुग के 'असाधारण अद्वितीय अद्भुत संत स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज'। उनकी वसीयत के कुल जमा 7-8 बिंदु उनकी महान सोच निर्मल, निर्विकार, निस्वार्थ भावना को तथा पाखंड मान बड़ाई जय जयकार की लालसा से दूर तथा मानव मात्र के कल्याण की भावना को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है इन बिंदुओं को पढ़ने मात्र से उनके पूरे व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। 'उनकी वसीयत कुछ इस तरह से थी।'

1. जिस प्रकार जीवित अवस्था में मैंने दंडवत प्रणाम चरण स्पर्श जय जयकार माल्यार्पण को निषेध किया इस शरीर को त्यागने के पश्चात भी इन सबका निषेध किया जाए।

2. जिस प्रकार जीवित अवस्था में मेरे नाम से न तो कोई मठ है न कोई आश्रम है न ही कोई मेरे नाम पर पाठशाला गौशाला इत्यादि है न ही मेरे प्रवचन आदि के लिए कोई चंदा आदि इकट्ठा किया इस देह को त्यागने के पश्चात भी इसका पालन किया जाए।

3. न तो मेरा कोई शिष्य है न ही कोई प्रचारक है न ही कोई उत्तराधिकारी था न होगा।

4. इस देह को त्यागने के पश्चात मेरे लिए किसी भी तरह का भोज अथवा वार्षिक उत्सव न किया जाए।

5. इस देह को त्यागने के पश्चात अंतिम संस्कार हेतु बैकुंठी अर्थी आदि न हो एक झोली में ले जाकर इस देह को गंगा के समीप अंतिम क्रिया सम्पन्न कर दी जाए। यदि गंगा न हो तो जहां गायों का विचरण होता हो वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया जाए।

6. मेरे देह की एवम उसकी अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर अथवा छाया चित्र न लिया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे रोका जाए। ज्ञात हो कि स्वामीजी ने पुरे जीवन काल लगभग 102 वर्ष में कभी भी अपनी फोटो नहीं खींचने दी क्योंकि उनका मानना था कि लोग भगवान के स्थान पर उनकी पूजा करने लगेंगे।

7. सभी सामग्री जैसे कलम कपड़े खड़ाऊ जूते वस्त्र इत्यादि को चिता के समीप जला दिया जाए ताकि उन वस्तुओं की कोई पूजा इत्यादि न कर पाएं। जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया है वहा कोई स्मारक इत्यादि न बनाया जाए। (उनका मानना था पूजा सिर्फ भगवान की हो मनुष्य की नहीं)

8. व्यवसायिक सामग्री दुकान कैलेंडर आदि में जहां विज्ञापन से धनोपार्जन किया जाता हो वहां अपना नाम तक छापने को निषेध करता हूँ।

उनकी हस्तलिखित वसीयत की प्रतिलिपि आनंदाश्रम रानी बाजार बीकानेर, राजस्थान में संरक्षित है। उनकी वसीयत को स्वामी जी के आदेश पर देहरादून के श्री राजेन्द्र कुमार जी धवन ने लिखा है और उस पर स्वामी जी के हस्ताक्षर भी है। स्वामीजी की वसीयत पर साक्षी के तौर पर इन 5 लोगों के हस्ताक्षर भी है—1. सिंहस्थ पीठाधीश्वर श्री क्षमा राम जी महाराज, सींथल, 2. श्री नवलराम जी महाराज, आनंदाश्रम रानी बाजार बीकानेर 3. श्री बृज रतन जी डागा भीनासर 4. श्री रामनिवास जी महाराज लाडनू 5. श्री शिव किसन जी राठी, बीकानेर।

मैनं अपने अल्प ज्ञान से जो कुछ लिखा वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है अन्यथा मेरे ज्ञान बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं कि इतने महान संत पर कुछ लिख सकूं। इस दौर में जहां अधिकाधिक संत मान बड़ाई को आतुर रहते हैं जिनके बड़े बड़े मठ और आश्रम है वहां इस युग में आज के युग में स्वामी राम सुख दास जी महाराज जैसे संत बड़े और गहरे शोध का विषय है। ■

सनातन

पंडित जीवेश्वर मिश्र

सर्वप्राचीन होते हुए भी जो नित्य नूतन है वह सनातन धर्म कहलाता है। इसका सम्बन्ध ब्रह्मा जी के उस काल से है जब वे सृष्टि निर्माण कर रहे थे, अर्थात सृष्ट्वा भचक्रं कमलोद्भवेन ग्रहै : सहैतद्भगणादिसंस्थै :.....इस प्रकार के अनेकों शास्त्र प्रमाण के अनसार जब स्वयं ब्रह्मा, सूर्यादि ग्रह, नक्षत्र, भचक्रं, पृथ्वी समेत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की स्थापना के क्रम में थे, उस काल से सनातन धर्म की परम्परा अजस्त्र रूपेण प्रवाहित हो रही है। और इसके बाद भी यह नित्य नूतन ही प्रतीत होता है, और यही कारण है कि सनातन धर्म की यह परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक व सर्वव्यापी है।

इसका सम्बन्ध न ही किसी पंथ, धर्म या वर्ण विशेष से है और न ही इसका कोई उद्गम श्रोत है, यह परम्परा अनादि काल से निरन्तर चलती आ रही है जिसके विभिन्न मत भी है जो सनातन धर्म की विविधताओं में एकता को द्योतित करता है।

क्योंकि सनातन धर्म में विविधताओं के बाद भी एकता होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मानवीयता के आधार पर चलती है। यह—

सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्,
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै
सर्व खल्विदं ब्रह्म।

इत्यादि अनेकों उद्घोषों से पोषित है और न केवल किसी पंथ, वर्ण, जाति या मत के कल्याण की भावना रखती हैं अपितु प्रत्येक मानव के साथ साथ भू, अन्तरिक्ष, जल, वायु, अग्नि, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर की उन्नति की कामना करती है।

जैसा कि यजुर्वेद में स्पष्ट वर्णित व प्रचलित मन्त्र है—

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षंशान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्ति, सर्वशाँन्तिः,

शान्तिरेवशान्ति, सा मा शान्तिरेधि।।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

भवार्थ : शान्तिः कीजिये, प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अन्तरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में! शान्ति राष्ट्र-निर्माण सृजन में, नगर, ग्राम में और भवन में, जीवमात्र के तन में, मन में और जगत के हो कण कण में आजकल यह भ्रान्ति कुछ व्यक्तियों को होती है कि सनातन केवल किसी एक वर्ण/जाति विशेष के द्वारा पोषित है और उसी के कल्याण की बात करती है।

वस्तुतः यह शंका उपर्युक्त उद्घोषों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि यहां किसी भी वर्ण या जाति विशेष को उद्देश्य नहीं किया गया है।

यह बात भी सर्वविदित है कि सनातन धर्म जिसके प्रमाणों पर अनादि काल से चलता आ रहा है उस वेद को चार भागों में महर्षि वेदव्यास ने ऋगथर्वसामयजुर्वेदों के रूप में विभक्त किया जो महर्षि पराशर व सत्यवती के पुत्र हैं।

महर्षि वेदव्यास की माता सत्यवती एक मछुआरिन थी। निषादराज, सबरी, आदि अनेकों कोटिशः पात्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनका चरित्र आज भी अनुकरणीय है व श्रद्धाभाव से देखा जाता है।

ये लोग भी किसी एक जाति या वर्ण से सम्बन्धित नहीं थें। सभी सनातनी के रूप में आज प्रतिष्ठित है।

कबीर, रविदास मीराबाई जैसे अनेक महापुरुषों का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान हे ये सब भिन्न भिन्न जाति/वर्ण से सम्बन्धित थें। लेकिन इन लोगों ने मुक्तकण्ठ से सनातन का जयघोष किया है और प्रत्येक सनातनी आज भी इन्हें श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं। क्योंकि कबीरदास जी कहते है—

जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।।

वस्तुतः सनातन धर्म की यह उद्गार भाव व सर्वव्यापकता ही प्रमुख कारण है कि हजारों वर्ष विदेशी आक्रांताओं के प्रहार के बाद भी यह अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है। फलतः आज न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी

सनातन प्रेमी इसे अपना आदर्श मानते हैं।

अतः हमारा कर्तव्य है कि सनातन धर्म के इस अनादि परम्परा को अक्षुण्ण रखें। इसके प्रत्येक उद्घोषों को आत्मशात करने का प्रयास करें एवं सनातन धर्म को पुष्ट करने में अपना हर संभव योगदान दें।

क्योंकि जिस प्रकार जल का अस्तित्व शीतलता, अग्नि का अस्तित्व दाहकता, पृथ्वी का अस्तित्व गन्धता यदि नष्ट हो जाती है तो इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा वह पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा।

ठीक उसी प्रकार सनातन हमारा अस्तित्व है और सनातन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है अतः आज के युग में सनातन रक्षा आत्मरक्षा से भी सर्वोपरि है।

धर्म की जय हो।

अधर्म का नाश हो।

प्राणियों में सद्भावना हो।

विश्व का कल्याण हो।

भारत माता कि जय हो।

सत्य सनातन धर्म की जय हो। ■

रावण एवं कंस का युद्ध

अरुण चूड़ीवाल

त्रेता युग के विभिन्न असुरों से युद्ध हेतु भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। त्रेता एवं द्वापर—रावण के लिए भगवान राम एवं कंस वध के लिए श्रीकृष्ण अवतार हुआ। सदैव आसुरी एवं दैवी शक्तियों के बीच संघर्ष होता रहा।

21वीं शताब्दी में प्रथण बार युद्ध दो आसुरी शक्तियों के मध्य हो रहा है। सुदूर रसातल में अति शक्तिशाली एवं धन संपन्न पूर्व एवं पश्चिम में महासागरों से सुरक्षित रावण है जिसकी विश्व विजय की महात्वाकांक्षा इतनी विशाल हो गई है कि समस्त अंतरराष्ट्रीय नियम, विधान, परंपराओं को तिलांजलि देकर वह अपनी विशाल सैन्य शक्ति का वीभत्स प्रदर्शन कर रहा है। रावण के कुकृत्य के पक्ष में मात्र एक सकारात्मक पक्ष है कि उसका विरोधी कंस `क आतंकवादी कट्टरवादी, अमानवीय विचारधारा का है।

सुदूर स्थित रावण का युद्ध कंस से हो रहा है। धर्मान्ध कंस के लिए स्वयं के शासन के लिए बाल हत्या, नारी अपमान, निज राज्य में संपूर्ण दमन चक्र एक सामान्य व्यवहार है। कंस ने अपने कालिया नाग को यमुना के स्थान पर गंगा में स्थापित कर दिया है, फलतः विश्व का संपूर्ण आवागमन मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

पाताल अहंकारी रावण मरुदेशीय कंस का यह विनाशकारी युद्ध विश्व की प्रगति एवं विकास के लिए एक संकट बन गया है।

कंस का समूल विनाश उसकी निर्दयता, कट्टरता, असहिष्णुता एवं अमानवीयता के लिए नितांत आवश्यक है, वही रावण की विजय उसके अहंकार को इंद्रासन की लालसा जागृत कर देगा।

रावण पर अंकुश रखते हुए कंस की पराजय के लिए किसी इंद्र की नर के रूप में आवश्यकता है। ■

अखिल भारतीय बजरङ्ग दलের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ, ভাগ্যনগর, তেলেঙ্গানা

"ভুল তারাই করে যারা কর্ম করতে থাকে। অকর্মন্যদের জীবন তো অন্যদের খুঁত খুঁজতেই শেষ হয়ে যায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ফ্রান্সের প্যারিসে রামনবমী উৎসব

রামনবমীর শোভাযাত্রা, কোচবিহার, উত্তরবঙ্গ

রামনবমীর শোভাযাত্রা, বজরঙ্গ দল, পুরুলিয়া, মধ্যবঙ্গ

দুর্গাবাহিনীর বৈঠক, ব্যারাকপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

রামনবমীর শোভাযাত্রায় দুর্গা বাহিনীর প্রদর্শন, খড়দহ, দক্ষিণবঙ্গ

মাতৃশক্তির প্রান্ত সম্মেলন, দক্ষিণবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু বার্তার পাঠক সম্মেলন, আইআইটি ক্যাম্পাস, খড়্গপুর, দক্ষিণবঙ্গ

সৌজন্যে :

‘চর অচর অর্পণ ন্যাস’ (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in